প্রবাহ

বার্ষিক পত্রিকা, জঙ্গিপুর কলেজ

২০২০-২০২১ ও ২০২১-২০২২

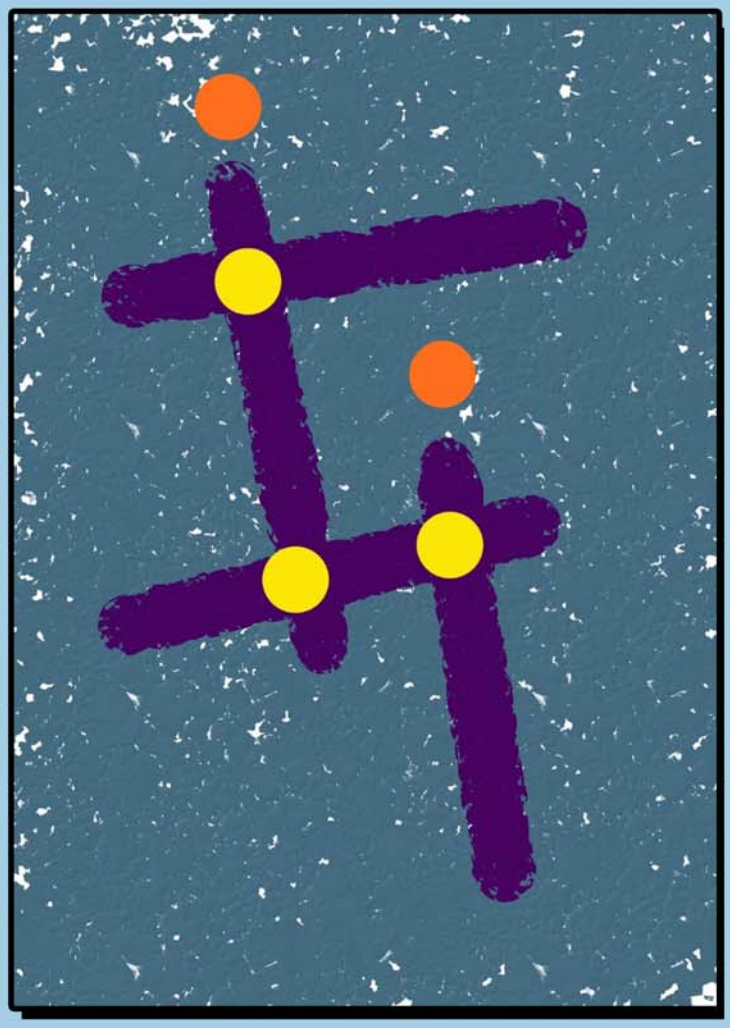

প্রবাহ

বার্ষিক পত্রিকা

জঙ্গিপুর কলেজ

২০২০-২১ ও ২০২১-২২

Jangipur College

Govt. Sponsored
NAAC Accredited
P.O.-Jangipur, Dist.-Murshidabad, Pin-742213, Phone No: 03483-264226
Website: jangipurcollege.in, e-mail:jangipurcollege@yahoo.com

PROBAHO

Annual Magazine 2020-21 & 2021-22 (Combined Issue)
Jangipur College, Murshidabad

উপদেষ্টা মণ্ডলী

ড. নবকুমার ঘোষ
শ্রী প্রীতিময় মজুমদার
ড. বাসুদেব চক্রবর্তী
ড. বিকাশ কুমার পাণ্ডা
শ্রী কেশবচন্দ্র ঘোষ

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক

ড. নুরুল মোর্তজা

প্রকাশ কাল

নভেম্বর ২০২১

গ্রন্থস্বত্ব

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ
জঙ্গিপুর কলেজ, মুর্শিদাবাদ

প্রচ্ছদ

অভিজিৎ রায়

অক্ষর বিন্যাস

আকাশ

ডি-২১, নেতাজী মার্কেট, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর কলেজের পক্ষে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ড. নবকুমার ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত এবং

আকাশ, ৫২/জি/১, ডলি আবাসন, বাবুপাড়া, গোরাবাজার, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়		৪
ভারপ্রাক্ত অধ্যক্ষের কলমে		৫
দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা — দায় ও দায়িত্ব	ভজনকুমার সরকার	৭
এক নজরে বাংলা ছন্দ	ড. অসীমকুমার মণ্ডল	১৩
প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নারীচেতনা	ডঃ হেনা সিনহা	২৬
সতীদাহ ঃ প্রথা ও সমাজ	সুশেন্দু বিশ্বাস	৩৩
ঔরাঙ্গজেব-দুহিতা জেবউন্নিসা	দোলনচাঁপা ঘোষ	৩৮
সাদা কালো ছবি	আশিস রায়	৪২
দরজিপাড়ার হালহকিকত : একটি সমীক্ষা		৪৩
Indian Economy : Hopping for better tomorrow.	Pritimoy Majumder	৪৬
Equivocation of Evil & the Discourse of Ambivalence in *Macbeth*	Dr. Basudeb Chakrabarti	৪৯
Human Rights and State Politics In India – A Case Study of Assam	Dr. Koyel Basu	৫৮
প্রাণের প্রাণ হনন	সাহাবুল সেখ	৭৩
শিক্ষার গুরুত্ব	ওবাইদুর রহমান	৭৭
কিছুক্ষণ	সালমান ইসলাম	৭৮
দুটি কবিতা	ড. বিমলচন্দ্র বণিক	৭৯
দুটি কবিতা	নিমাইচন্দ্র সাহা	৮০
দুটি কবিতা	অপর্ণাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী	৮১
দুটি কবিতা	রীণা কংসবণিক	৮২
List of Governing Body of Jangipur College & Teaching, Non-Teaching Staff		৮৩

সম্পাদকীয় কিংবা আমাদের কৈফিয়ত

২০২০ সালের সূচনা থেকে এক অচেনা ভাইরাসের সংক্রমণে পৃথিবীর মানুষ বেসামাল হয়ে পড়েছে। কোভিড-১৯ নামক সে ভাইরাস একবিংশ শতাব্দীর অতি উন্নত চিকিৎসা বিজ্ঞানকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। স্মরণকালে পৃথিবীর মানুষ এত বিপন্ন বোধ করেনি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এক শ্রেণির মানুষের সীমাহীন মুনাফা-লোভ। সভ্যতার ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যুদ্ধবিগ্রহ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, মহামারি-মন্বন্তর মতো চরম সংকটকালে (রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সহায়তায়) এক শ্রেণির মুনাফাখোর ব্যবসায়ী মানুষকে আরও সংকটের মধ্যে ঠেলে দেয়। করোনা অতিমারির সময়ও তার ব্যত্যয় হয়নি। সেই বিপন্নতার অভিঘাত অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো শিক্ষাক্ষেত্রকেও সংকটাপন্ন করেছে। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পঠনপাঠন ব্যাহত হয়েছে, ব্যাহত হয়েছে ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত কর্মসূচি। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই সময় আমরা জঙ্গিপুর কলেজের বার্ষিক পত্রিকা 'প্রবাহ' প্রকাশ করতে পারিনি।

সেই অতিমারির সংকট কাটিয়ে মানুষের জীবনযাপন যখন প্রায় স্বাভাবিক হয়ে আসছে, তখনও ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাঙ্গনে আসার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ থেকে গেল। শেষ পর্যন্ত এ বছর (২০২১) ছাত্রছাত্রীদের জন্য তাদের প্রিয় শিক্ষায়তনের দরজা খোলা হল। ফলে ক্লাসরুমে বসে পঠনপাঠনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের অন্যান্য কর্মসূচিগুলি রূপায়ণ করার সুযোগ পাওয়া গেল; সুযোগ পাওয়া গেল কলেজ পত্রিকা প্রকাশের। বর্তমান সংখ্যাটি একইসঙ্গে ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ সংখ্যা। স্বাভাবিকভাবেই এই সংখ্যায় বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ কম। পত্রিকার মান অক্ষুণ্ণ রাখার তাগিদে কলেজের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের লেখা দিয়ে সাজাতে হয়েছে। আশা করি খুব শিগগির করোনা অতিমারির প্রভাব কাটিয়ে ছাত্রছাত্রীরা নবযৌবনের চাঞ্চল্যে আবার ভরিয়ে তুলবে শিক্ষাঙ্গন, প্রকাশ করবে তাদের সৃজনশীলতা।

১৮ নভেম্বর ২০২১
জঙ্গিপুর কলেজ

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক

ভারপ্রাক্ত অধ্যক্ষের কলমে

আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠ্যক্রমের বিষয়গুলির আলাপ-আলোচনা-অনুশীলন ইত্যাদির বাইরে যে আরও অনেক বিষয়ের আলোচনা-চর্চা-প্রতিযোগিতা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়, যা শিক্ষাকে পূর্ণতা দানের সঙ্গে আনন্দময় করে তোলে, তারই একটি অঙ্গ পত্রিকা-প্রকাশ। আমাদের কলেজের বার্ষিক পত্রিকা এই লক্ষ্যে প্রতিবছর নিয়মিত প্রকাশিত হয়। এ কাজের দায়িত্ব পালন করে নির্বাচিত ছাত্র সংসদের সদস্য ছাত্রছাত্রীরা বিশেষ করে পত্রিকা সম্পাদক। দায়িত্ব প্রাপ্ত অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা লেখা নির্বাচন থেকে শুরু করে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের সাহায্য করেন। প্রতি বছরের মতো এবারও বিজ্ঞপ্তি দিয়ে কলেজের বর্তমান ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও শিক্ষাকর্মীদের কাছে পত্রিকার জন্য লেখা চাওয়া হয়। অনেক লেখা জমাও পড়ে। লেখা নির্বাচনের সময় দায়িত্বপ্রাপ্ত অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা লক্ষ করেন ছাত্র-ছাত্রীরা যে-সব লেখা জমা দিয়েছে তার অধিকাংশের মান বার্ষিক কলেজ-পত্রিকায় প্রকাশের অনুপযুক্ত। কয়েক বছর থেকেই দায়িত্ব প্রাপ্ত অধ্যাপকরা লক্ষ করছিলেন যে কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ লেখার প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের ঔদাসীন্য বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং লেখার মানও ক্রমশ নিম্নগামী। এর মূলে হয়তো চাকরিকেন্দ্রিক পড়াশুনা, মোবাইল ফোনের যথেচ্ছ ব্যবহার ও দূরদর্শনে প্রদর্শিত আকর্ষণীয় সিরিয়াল-সিনেমা-নাচগান ইত্যাদির প্রভাবই ক্রিয়াশীল। অধ্যাপকরা সেই কারণে প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের কিছু ভালো লেখা এ বছর পত্রিকায় প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। দুটি উদ্দেশ্য রয়েছে এর পিছনে। প্রথম লক্ষ্য, শুধুমাত্র কলেজের বর্তমান ছাত্র-ছাত্রী নয়, তার বাইরের বৃহত্তর শিক্ষিত জনগণের হাতে পৌঁছবে যে পত্রিকা, যার উপর কলেজের মান-মর্যাদা নির্ভর করছে — অনেকাংশে তার একটা নির্দিষ্ট মান বজায় রাখা। আর দ্বিতীয় লক্ষ্য হলো প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের ভালো লেখার দ্বারা বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের সেই মানের লেখার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করা। পত্রিকায় অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও শিক্ষাকর্মী বন্ধুরা অনেকে লেখা দেন এবং তা পত্রিকার আকর্ষণ বৃদ্ধি করে। আশা করি এ বছরও তার অন্যথা হবে না। আমরা চাই কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা আরও বেশি করে সংস্কৃতি-চর্চা করুক, সাহিত্যচর্চার প্রতি যত্নশীল হোক এবং তার প্রতিফলন ঘটুক কলেজ-পত্রিকাতেও। কারণ সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার প্রভাব মানব-জীবনে সুদূর-প্রসারী। বর্তমান বিশ্বে মানবতা যেভাবে বিধ্বস্ত হচ্ছে তার প্রতিরোধ করতে হবে বিশ্বের শিক্ষিত ও সচেতন মানুষকেই। আর তার অন্যতম প্রধান কাজ সুস্থ সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা।

ধন্যবাদান্তে
ডঃ নবকুমার ঘোষ
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, জঙ্গিপুর কলেজ

‘‘মনুষ্যত্বের শিক্ষাটাই চরম শিক্ষা, আর সমস্তই তার অধীন’’।

— **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**

‘‘অন্ধের মতো কিছু না বুঝিয়া, না শুনিয়া, ভেড়ার মতো পেছন ধরিয়া চলিও না। নিজের বুদ্ধি, নিজের কার্যশক্তিকে জাগাইয়া তোলো।’’

— **কাজী নজরুল ইসলাম**

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা — দায় ও দায়িত্ব

ভজনকুমার সরকার
প্রাক্তন সভাপতি, কলেজ পরিচালন সমিতি (২০১২-২০১৭)

ভারত প্রাচীনকালে শিক্ষায় ছিল বিশ্বের একটি অগ্রণী দেশ। কিন্তু স্বাধীনতার ৬৯ বছর পরেও বিশ্বের সূচকে ভারত বারে বারে চিহ্নিত হয় একটি অনগ্রসর দেশ হিসাবে। রাষ্ট্র সংঘের সর্বশেষ মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০১৫ পুনরায় শিক্ষায় ভারতের পশ্চাদপদতার তথ্যাবলী উপস্থাপিত করেছে। শিক্ষায় বিশ্বের ১৪৫টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ৯২ তম। উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করার যুবক যুবতী যথা ১৬-২৩ বৎসর বয়সে ২৮.৭ শতাংশ বর্তমানে শিক্ষালয় থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে থাকে এটা বিশ্বের গড়। ভারতে ঐ গড় ১২ শতাংশ মাত্র। শিক্ষার এই অনগ্রসরতা দেশের উন্নয়নের পথে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা। সারা বিশ্বের দেশগুলির সরকার তাদের মোট বাজেটের প্রায় ৫ শতাংশ বরাদ্দ করে শিক্ষাখাতে। আর আমাদের দেশে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির শিক্ষাখাতে মোট বরাদ্দের পরিমান মাত্র ৩.১ শতাংশ। অত্যন্ত লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় এই যে সারা পৃথিবীর মোট প্রাপ্ত বয়স্ক নিরক্ষর মানুষের ৩৩.৮ শতাংশ মানুষ আমাদের দেশেই বাস করেন এবং বিরাট সংখ্যক শিশু প্রাথমিক শিক্ষাই সমাপ্ত করতে পারে না। যারা বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে, বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া জেলাগুলিতে একটা বড় অংশের ছাত্র ছাত্রীরা পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে বাংলা রিডিং পড়তে পারে না, ইংরেজি পড়তে পারার তো প্রশ্নই ওঠে না। সাধারণ যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ জানে না। স্বভাবতই তারা শ্রেণিকক্ষে কোনো আকর্ষণ বোধ করে না। ধীরে ধীরে তারা স্কুলে আসা ছেড়ে দেয়। এইভাবে ড্রপ আউট এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

গণতান্ত্রিক জীবনবোধের ধারাবাহিক ফলস্রুতিতে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার অঙ্গণে এখন বঞ্চিত শোষিতদের একটা বড় অংশ প্রবেশের সুযোগ পেয়েছে। তাদের জন্য আকর্ষণীয় বিদ্যালয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিটি শ্রেণীকক্ষে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। আমেরিকায় বসবাসকারী প্রবাসী একজন ভারতীয় ছাত্রের সাথে আলাপ হলে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম সে দেশের বিদ্যালয়ের পঠনপাঠন পদ্ধতি কেমন? সে বলল, 'এখানে আমার আত্মীয় স্বজন রয়েছে। এদেশের স্কুল ও আমি দেখেছি। এই দেশের যেমন শিক্ষক মহাশয়রা একটি ক্লাস শেষ করে অন্য একটি ক্লাসে পড়াতে যান। ঐ দেশে ঠিক তার উল্টোটা ঘটে। সেখানে মাষ্টার মশায়রা পৃথক পৃথক Well equipped class room-এ বসে থাকেন। ছাত্ররা ক্লাস রুম পরিবর্তন করে। ঐ দেশে প্রতিটি ক্লাসরুমই এক একটি বিজ্ঞানাগার। সে ইতিহাস, ভূগোল, ভাষা ও সাহিত্য, বিজ্ঞান যে বিষয়ের ক্লাসই হোক না কেন। আমাদের দেশের বিশেষ করে গ্রাম অঞ্চলে বেশিরভাগ ছাত্র ছাত্রী First Generation Learner. তাদের বাড়িতে পড়ার কোনো পরিবেশই নেই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অভিভাবকগণ হয় লেখাপড়া কম জানেন নয়তো উপার্জনের কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে ছেলে মেয়েদের দিকে নজর দিতে পারেন না। ঐ সকল ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষাগ্রহণের একমাত্র ভরসা স্থল তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে যদি আকর্ষণীয় করে তোলা না যায়, তারা যদি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভালোবাসা না পায়, শ্রেণীকক্ষে পাঠদান যদি আনন্দদায়ক না হয় তাহলে তারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে

যেতে আগ্রহী হবে না। শ্রেণীকক্ষের বাইরে প্রচুর প্রলোভন। সেই প্রলোভন থেকে তাদের সরিয়ে এনে শ্রেণীকক্ষের পঠন পাঠনে মনোনিবেশ করানোর দায়িত্ব সকলের। শুধুমাত্র শিক্ষক শিক্ষিকা বা শুধুমাত্র অভিভাবকের পক্ষে একাজ করা অত্যন্ত কঠিন। তাই সমাজের সকল শ্রেণির মানুষকে একাজে এগিয়ে আসতে হবে। সমাজের একটা অংশকে পিছনে ফেলে রেখে আর একটা অংশ কোনোভাবেই এগিয়ে যেতে পারে না। তাই জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলকে শিক্ষার আঙিনায় নিয়ে এসে শিক্ষা দেবার দায়িত্ব যেমন সরকারের তেমনি সরকারকে এ কাজে সহযোগিতা করা আমাদের সকলের কর্তব্য। আমরা বিশ্বাস করি যে ছাত্র-ছাত্রীরা যদি প্রতিদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসে এবং শিক্ষিকা ও শিক্ষকগণের সংস্পর্শে থাকে তাহলে তারা অবশ্যই কিছু না কিছু শিখবে। তাদের উদ্দেশ্য অবশ্যই সফল হবে। সেক্ষেত্রে মোটা অর্থ ব্যয় করে প্রাইভেট টিউশন পড়ার প্রয়োজনই হবে না।

শ্রেণিকক্ষের বাইরে সহপাঠক্রমিক কর্মধারাও তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিত্ব বিকাশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। মাঠে সমবেতভাবে খেলাধুলার চর্চা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পত্রিকার মাধ্যমে সাহিত্য চর্চা, বিতর্কের আসরে যুক্তি বিচার, বিভিন্ন ধরনের চারুকলা অনুশীলন ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে এগুলির কোনো বিকল্প নেই। মাঝে মাঝে শিক্ষামূলক ভ্রমণ এবং শিবির জীবনের আয়োজন করলে শিক্ষার্থীর মানসিকতায় উল্লেখযোগ্য মাত্রা যোগ হয়।

আজকের পটভূমিকায় আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশনের প্রধান 'জ্যাক দেলর'-এর সুপারিশটি সবচেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক, তা হল - যৌথভাবে বাঁচতে শেখা (Learning to leave together)। সমবেত ভ্রমণ ও শিবিরের অভিজ্ঞতা মানুষ হয়ে ওঠার পথে এক অমূল্য পাথেয়। সার্বিক শিক্ষার আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো পাঠ্যসূচির বাইরেও স্বাধীনভাবে নানাবিধ বিষয়ে বই পড়া। সমাজকে চেনার জন্য, জীবনের সমস্যা সম্ভাবনার সম্পর্কে ঘাত-প্রতিঘাত প্রভৃতির স্বাদ পাওয়ার জন্য ও মূল্যবোধের শিক্ষার জন্য সৎ সাহিত্য পাঠ একান্ত প্রয়োজন.।

স্বাধীনতার পূর্বে আমাদের দেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা সাধারণভাবে চালু ছিল তাতে ভাষা (প্রধানত বিদেশি ভাষা) শিক্ষার উপর যত গুরুত্ব ছিল তত গুরুত্ব ছিল না বিজ্ঞান ও অন্যান্য জ্ঞানমূলক শিক্ষার উপর। বিদেশি শাসকশ্রেণী নিজেদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও পাঠ্যক্রম স্থির করেছিল। বিদেশি শাসকের উদ্দেশ্য ছিল তাদের কাজের সুবিধার জন্য কিছু ভারতীয় কেরাণী তৈরী করা। যার ফল স্বাধীনতার ৬৯ বৎসর পরেও আমাদের দেশের শিক্ষার্থীদের ভুগতে হচ্ছে। ইংরেজ আমলের সেই শিক্ষা পদ্ধতি থেকে আমরা এখনও মুক্ত হতে পারিনি। যার ফল স্বরূপ ছাত্র-ছাত্রীদের মুখস্থ নির্ভর লেখাপড়া এখনও বর্তমান। রয়ে গেছে পরীক্ষা ব্যবস্থাতেও ত্রূটি। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় হলো ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে শিক্ষা ব্যবস্থায় কোনো পরিবর্তনের চেষ্টা হলেই এক শ্রেণীর মানুষকে গেল গেল আওয়াজ তুলতে দেখা যায়। তাদের ধারণা গতানুগতিক পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটলেই যেন সব শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবটা কী? মাধ্যমিক থেকে ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং সর্বত্রই পরীক্ষার হলে টোকাটুকি একটা বড় অংশের ছাত্র-ছাত্রীদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। পরীক্ষাহলে মাষ্টার মশায়রা একটা অংশের ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকারে পরিণত হয়েছে। মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা নির্বিশেষে পরীক্ষার দিনগুলিতে পরীক্ষা কেন্দ্রগুলি থেকে মাইক্রোজেরক্স করা বস্তা বস্তা কাগজ পাওয়া যায়। এর জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের উত্তর বলে না দিলে বা টুকতে সাহায্য না করলে তাদের ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে নিগৃহীত হতে হয়। টোকাটুকিটা একটা অংশের ছাত্র-ছাত্রীরা যতখানি দায়ি তার থেকে বেশি দায়ি পঠন-পাঠন পদ্ধতি ও বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থা। আমাদের দেশে পরীক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশ্বকবি প্রশ্ন তুলেছেন যে, ''এটা কিরকম শিক্ষা? পরীক্ষার ঘরে যারা চাদরের ভিতরে বই নিয়ে যায় তারা ধরা পড়লে

তিরস্কার-বহিস্কার হয়। আর যারা পরীক্ষার হলে মগজের মধ্যে করে বই নিয়ে যায় এবং খাতা ভরিয়ে লেখে তাদের আমরা পুরস্কৃত করি। কেন এই অবিচার?"

এছাড়া ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগে সেরেস্তাদারের পদে নিযুক্ত ছিলেন। এ কলেজে ইংল্যান্ড থেকে সদ্য আসা তরুণ সাহেবদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। পাঠ সমাপ্ত হলে পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হলে তবেই তারা কোম্পানীর চাকরি পেতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাদের বাংলা শেখাতেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে হবু ইংরেজ সিভিলিয়নদের বার্ষিক পরীক্ষা নেওয়ার সময় গোটা পরীক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কেই তার বিরূপ ধারণা তৈরি হয়ে যায়। বিলেত থেকে কোম্পানির চাকরির আশায় এসে পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হয়ে ব্যর্থ মনোরথে আবার বিলেতে ফিরে যাওয়ার ঘটনা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। একটি যুবকের বিষয় বুৎপত্তির পরীক্ষা একটি মাত্র বার্ষিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় নির্দিষ্ট করা যে বিজ্ঞান ও বিবেচনা প্রসূত নয়, সে বিষয়ে তিনি স্থির নিশ্চিত হয়ে যান। সেই সময় থেকে এই পরীক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তন করার কথা ভাবতে শুরু করেন। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ৬ই এপ্রিল বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের সহ-সম্পাদক পদে যোগ দেন। এখানে এসেও একই অবস্থা তার চোখে পড়ল। তার সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষ পদে উন্নীত হওয়া পর্যন্ত পাঠদান ও পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি বিশেষ কিছু পাল্টায়নি। পাঠ্য বিষয় বৈচিত্র্যহীন, একঘেয়ে ও যান্ত্রিক। নতুন ভাবনা নেই; নতুন বিষয়ে ও ভাবনায় ছাত্র-ছাত্রীকে আকর্ষণ করার কোনো চেষ্টাও নেই। বিভিন্ন পরীক্ষা নেওয়ার সেই গতানুগতিক পদ্ধতি। একবার মাত্র বার্ষিক পরীক্ষা, ধরা বাঁধা প্রশ্ন তালিকা, অবিরাম মুখস্থ ও উদ্‌গীরণ। পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি নিয়ে বারাণসি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ড. জে. আর. ব্যালেনটাইনের সঙ্গে তাঁর অনেক চিঠিপত্র লেখা লেখি হয়েছে। কিন্তু পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন সুপারিশ করে তিনি একটি জরুরি ও উল্লেখযোগ্য চিঠি লেখেন এফ.জে.মোয়াট সাহেবকে। মোয়াট সাহেব তখন কাউন্সিল অব্ এডুকেশনের সম্পাদক। তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। পাঠ্যসূচী নির্মাণ বা পরীক্ষা গ্রহণ ইত্যাদি নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হত কাউন্সিল অব্ এডুকেশনের তত্ত্বাবধানে। মোয়াট সাহেবকে লেখা ব্যিদাসাগর মহাশয়ের চিঠিখানি ১৫০ বছর পরেও খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং এর প্রতিটি সুপারিশ আজও অনুস্মরণযোগ্য। চিঠিটি নিম্নে উল্লিখিত হল :

Form
The Principal, Sanskrit College

To
F. J. Mouat Esq. MD
Secretary, Council of Education,
Dated Fort William, 21 January 1854.

Sir,

I have the honour to forward the following proposal which I beg to request, you will be so good as to submit to the council for their consideration and orders.

The examination in this Institution are held annually, this system of examination is in my humble opinion open to serious objection. The main object of an academic examination ought to be to supply a well regulated stimulus to proper exertion. This object is but very partially gained by making the examination annual. Under this system the pupils release their labours after the close of the session and do not resume them in an earnest manner till the time of the examinations draw near. During the first month of the year they plod along with their routine course of study with indifferent attention while the "Craming" system is in requisition during the concluding months. Their industry therefore is unequable and the consequence is that a habit of industry is not acquired. Moreover the over exertion of the last two months of the session induces several chronic diseases such as headache, dyspepsia, dysentery, opthalmia etc. This is another circumstance in the present system of examination which is deeply to be regulated and which though accidental is altogether of rare occurrence. A student may be well known to be intelligent, industrious and attentive and one who would certainly be entitled to the highest records were it in his power to pass the examination, but he may suddenly fall ill at that time of examination, and all his exertions during the whole year would in the case remain unrewarded. I have with care and attention observed this state of things for the last three years and am convinced that long as the present system of examination continues it will be impracticable to remove the evils complained of.

Under the circumstances I beg most respectfully to propose that the present system of examination be discontinued and that in its stead the following plan be adopted.

1. Examination to be held every month in the Junior classes and in every two months in the Senior ones.
2. The award of scholarships and other rewards to be decided by the aggregate result of these examinations.
3. Of the Sanscrit and Vernacular portions of studies, examinations to be conducted by the Principal with the co-operation of the Professors.
4. Of the English portion of studies the examination to be conducted by the Principal with the co-operation of the Masters and Professors.
5. The final examinations alone to be conducted by the examiners appointed by the Council.

If the Council be pleased to sanction the proposal the students will make equal progress throughout the year. They will not be obliged to over exert themselves in the concluding months of the session and there is no doubt they will be thus enabled to attain greater

proficiency than they usually manifest under the present system and above all, they will acquire a habit of industry from the want of which it may be safely affirmed, the great majority of students do not keep up their studies in after life though they distinguish themselves while at College.

In conclusion I beg leave to request the favor of your moving the Council to sanction the proposal at least experimentally for three years.

I have the honour to be
Sir
Your most obedient servant
Ehswar Chandra Sharma

বহু রক্তক্ষয়ের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেলাম। কিন্তু ১৯৫০ সালে যখন আমাদের দেশের সংবিধান রচিত হল তখন শিক্ষার মত একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংবিধানের মৌলিক অধিকারের তালিকায় স্থান পেল না। সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতির ৪৫ নং অনুচ্ছেদে বলা হল পরবর্তি ১০ বছরের মধ্যে দেশের ৬-১৪ বৎসর বয়স্ক প্রতিটি শিশুর শিক্ষার দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করবে। কিন্তু তা বাস্তবায়িত হল না। স্বাধীন দেশেও অভাবনীয় বঞ্চনার শিকার হল দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা। স্বাধীন ভারতে বিশ্বের সর্বাধিক সংখ্যক শিক্ষা কমিশন নিযুক্ত হয়েছে। আর তাদের মূল্যবান সুপারিশগুলির প্রতি প্রদর্শিত হয়েছে ক্ষমার অযোগ্য উপেক্ষা। একজন সুবিখ্যাত শিক্ষাবিদ এই প্রসঙ্গে একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন 'The number of education commission of India may be compared with the world famous waterfall of 'Nayagra' and the implementation of thei recommendations may correctly be compared with the world famous desert of Sahara' তবু যেটুকু ব্যবস্থা বর্তমানে রয়েছে তার মধ্যেই আমাদের প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে আমাদের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাজ করতে হবে। এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও আমরা শিক্ষক মহাশয়রা যদি স্বীয় দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যবোধের ব্যাপারে সচেতন থাকি এবং তা যথোপযুক্তভাবে পালন করি তাহলে আমাদের প্রিয় শিক্ষার্থী সমাজ হতে পারে অনুপ্রাণিত। তাদের মধ্যে নিহিত মেধার হতে পারে স্ফুরণ। সমাজ উন্নয়নে তাদের ভূমিকা হতে পারে অর্থবহ। দীল্লিতে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুবিশাল আধুনিক ভবনের উদ্বোধন করার সময় আমাদের দেশের তদানিন্তন রাষ্ট্রপতি প্রয়াত এ.পি.জে.আব্দুল কালাম মহাশয় একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন তা হল 'A muddy teaching be conferred in a marble hall, but a marvelous teaching may be awarded in muddy walls.' এখানেই হচ্ছে শিক্ষায় উৎসর্গীকৃত প্রকৃত শিক্ষকের ভূমিকার দৃষ্টান্ত।

একবিংশ শতাব্দির শিক্ষা কমিশন উপরিল্লিখিত শিক্ষাবিদের মন্তব্যের মতই বলেছেন - এই যে এতো শিক্ষা কমিশন এত দিন ধরে বসল, তারা এত ভালো ভালো সুপারিশ করলেন, তার কোনটাই কার্যকরী হলো না কেন বলতে গিয়ে তাঁরা বলেছেন, শিক্ষার লক্ষ্য যে সামর্থ অর্জনের মধ্য দিয়ে যে মূল্যবোধগুলিকে অর্জন করা সেই মূল্যবোধগুলি জীবনাচারণে প্রতিফলিত হয়নি। তার জন্যই তো শিক্ষা সফল হতে পারল না। আমি যে শিক্ষা দিচ্ছি তা আমার নিজের জীবন যাত্রায় প্রতিফলিত হচ্ছে না, সেটাই তো অসন্তোষ সৃষ্টি করছে ছাত্রদের মধ্যে। মুখে বলছি সকলের

শিক্ষার অধিকার আছে। কিন্তু শ্রেণিকক্ষে বলছি, 'তোর দ্বারা কিছু হবে না'। ইতালীয় একটা স্কুলে ঐ রকম আটজন ছাত্র তারা বছর বছর ফেল করত। তাদেরকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হল। এবার তারা করল কি School of Barbiana তে গেল, নিজেরা একসাথে বসে পড়াশোনা করতে আরম্ভ করল (Co-operative learning)। একসঙ্গে বসে পড়াশোনা করে দেখা গেল কিছুদিনের মধ্যেই সবাই পাশ করে উঁচু ক্লাসে উঠে গেল। তখন তারা ঐ আগের স্কুলের শিক্ষককে একটা চিঠি লিখেছিলেন। পরবর্তীকালে সেই চিঠিটা বই আকারে মুদ্রিত হয়ে সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত হয়েছে। বইটার নাম অনেকেই জানেন — 'এ লেটার টু দ্য টিচার বাই দ্য স্কুল অব বার্বিয়ানা'। আর এই অভিজ্ঞতা নিয়ে ব্রাজিলের পাওলো ফ্রেয়ার বললেন - এই যে এক মুখী জ্ঞান দেওয়া, জমা করা এবং এই যে বিষয় নির্ভর স্মৃতি চর্চা এটা শিক্ষার অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থাৎ ছাত্র-ছাত্রীদের মগজ কোন ব্যাঙ্কের ভল্ট নয় ইত্যাদি। এবং বললেন যে, এর বিরুদ্ধে শিক্ষক বিহীন শিক্ষা এটাই ভাল। তার 'পেডাগজি অব দ্য অপরেস্‌ড্' বইটা আছে। খুব নাম করা একটা বই। এই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে ১৯৮১ সালে আমেরিকা সি.আই. এর উদ্যোগে কুম্‌স্ বলে এক ভদ্রলোক ঐ বিশ্ব শিক্ষা সংকট তত্ত্ব বাজারে ছাড়লেন। তারফলে আজকে এই একবিংশ শতকে শিক্ষার ওপর যে 'পণ্যের আক্রমণ' বা আগ্রাসন এবং এই যে কর্মসংস্থানহীন উন্নয়ন (Jobless growth) তার ফলে এই সংকট। এটা দূর করতে হলে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে মূল্যবোধগুলোকে প্রতিফলিত করতে হবে। আমাদের দেশে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার উপর নামিয়ে আনা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের আক্রমণ। সরকার পোষিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পরিবর্তে প্রথাবহির্ভূত শিক্ষাকে উৎকৃষ্ট হিসাবে প্রক্ষেপণ করা হচ্ছে রাষ্ট্রের দায় ঝেড়ে ফেলার কৌশলী বিকল্প হিসাবে। অথচ UNESCO নিয়োজিত আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশনের উপলব্ধি হল : "There is no substitute of teacher - pupil relationship which is under pinned by authority and developed through dialogue.' Dellor commission-এর আরো বিশ্বাস একমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে দিয়েই ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে ও নানান ধরনের জ্ঞানার্জন করতে পারেন। ইউরোপের ছাত্ররা স্লোগান তুলেছে — "No teacher no future."

আমাদের দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে একটি জনমুখী শিক্ষানীতি স্বাধীনতার পরেও রূপায়িত হতে দেখা গেল না। শিক্ষাক্ষেত্রে চিন্তার এই অস্বচ্ছতার মধ্যে দাঁড়িয়ে সারা দেশের শিক্ষক সমাজকে বাস্তবভিত্তিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষা প্রসারের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। কাজটা কঠিন, কারণ সমাজ নানা সমস্যায় জর্জরিত। সমাজের সমস্যা শিক্ষা ব্যবস্থাকেও প্রভাবিত করছে। সমাজজীবনের বিপর্যয় শিক্ষাক্ষেত্রেও সংক্রমিত হচ্ছে। সংবেদনশীল মন নিয়ে আমাদের শিক্ষাপ্রক্রিয়া পরিচালনায় উদ্যোগী হতে হবে। শিক্ষার্থী আনন্দের সাথে সবকিছু জানতে ও প্রায়োগিক দক্ষতা অর্জন করতে উদ্বুদ্ধ হবে। আমরা শিক্ষক সমাজ সকল শিক্ষার্থীর প্রত্যাশাপূরণে প্রতিনিয়ত সতর্ক আছি। আগামি দিনে বাড়তি দায়িত্ব গ্রহণ করে আমরা সকলেই সকল শিক্ষার্থীর শিক্ষা সুনিশ্চিত করতে এগিয়ে আসব, আমাদের কাছে সমাজের এই হল প্রত্যাশা।

ছাত্র-ছাত্রীদেরও সরকার পোষিত যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে তারা যুক্ত রয়েছে সেখানে নিয়মিতভাবে যেতে হবে। সরকারী ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে হবে। Library, Laboratory, ও যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের পরামর্শ প্রভৃতি অমূল্য সুযোগ তাদের গ্রহণ করতে হবে এবং গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজের উপযুক্ত মূল্যবোধ সম্পন্ন একজন নাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে।

এক নজরে বাংলা ছন্দ

ড. অসীমকুমার মণ্ডল
প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

আমাদের চারপাশে প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে ঝর্ণার জলধারা প্রবাহিত হচ্ছে, মৃদুমন্দ বাতাসে গাছের পাতা নড়ছে, মানুষ পথে হাঁটছে একইভাবে, এলোমেলোভাবে নয়। ফলে তার মধ্যে একটা একই ধরণের সামঞ্জস্যপূর্ণ স্পন্দন সৃষ্টি হচ্ছে — এটাই ছন্দ। কবিতায় ছন্দের সৃষ্টি হয় সুপরিকল্পিত ধ্বনি-বিন্যাসের ফলে। কবিতা রচনায় এই ছন্দের প্রয়োজন কোথায়? মানুষের গভীর আবেগ ও হৃদয়ানুভূতি গদ্যভাষায় শব্দের বাচ্যার্থ বা লক্ষ্যার্থ দিয়ে প্রকাশক করা সম্ভব নয়। এটা সম্ভব কবিতার ব্যঙ্গ্যার্থের মাধ্যমে। যেমন, রাধা কৃষ্ণকে খুব ভালোবাসে, এই বাক্যে কৃষ্ণের প্রতি রাধার ভালোবাসার গভীরতা যতটা প্রকাশ পায়, তার থেকে অনেক বেশি গভীরতা সৃষ্টি হয় যখন কবি বলেন — ''সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম / কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো / আকুল করিল মোর প্রাণ।'' কারণ এখানে ব্যঙ্গ্যার্থ প্রকাশিত হয়েছে। কবিতায় এটা প্রকাশ করার জন্যই কবিরা রীতি, অলংকার, ছন্দ, চিত্রকল্প ইত্যাদির আশ্রয় নেন।

বাংলাছন্দ সম্পর্কে সম্যক ধারণা সৃষ্টি করতে হলে আমাদের আগে জানতে হবে মুক্তস্বর বা পূর্ণস্বর, খণ্ডস্বর, যৌগিক স্বর, দল, যতি, কলা, মাত্রা ইত্যাদি কাকে বলে। তার পূর্বে আর একটি কথা — ছন্দ নির্ণয় করতে হবে চোখে বর্ণ দেখে বা গুণে নয়, কানে ধ্বনি শুনে। বাংলা ভাষায় প্রকৃত পক্ষে পূর্ণ স্বরধ্বনি আছে ছ'টি — অ, আ, ই, উ, এ, ও। এগুলি পূর্ণ রূপে উচ্চারিত হয় তাই এই নাম। এই বর্ণগুলির মধ্যে ই্, উ্, এ্, ও্ কখনও কখনও অর্ধেক উচ্চারিত হয় বলে তখন এদের খণ্ডস্বর বলা হয়। ঐ, ঔ, (ও+ই, ও+উ) এবং ছয়টি পূর্ণস্বর ও চারটি খণ্ডস্বর মিলে অই্, আই্, আউ্, এই্, এউ্, ইউ্, উই্, ইই্ ইত্যাদি ষোলটি বা তারও কিছু বেশি যৌগিক স্বর আছে। দুটি স্বর একঝোঁকে উচ্চারিত বলে এরা যৌগিক স্বর। যৌগিক স্বরের প্রথম স্বরটি পূর্ণ, দ্বিতীয়টি খণ্ড। বাঙালির উচ্চারণে ই, ঈ এবং উ, ঊ মধ্যে পার্থক্য নেই, তাই ছন্দের আলোচনায় ঈ এবং ঊ-কে পৃথক ধ্বনি হিসেবে ধরা হয়নি। চারটি খণ্ডস্বর এবং সমস্ত ব্যঞ্জনধ্বনিকে বলা হয় খণ্ডবর্ণ। ব্যঞ্জনবর্ণকে খণ্ডবর্ণ বলার কারণ এরা স্বরধ্বনির সাহায্য ছাড়া উচ্চারিত হয় না।

বাগ্‌যন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে অর্থাৎ একঝোঁকে একটি শব্দের যতটুকু ধ্বনি উচ্চারণ করা যায় তাকে দল বা অক্ষর (Syllable) বলে। অন্যভাবে বলা যায় অনুযতি দিয়ে নির্দিষ্ট ধ্বনিখণ্ডই দল বা অক্ষর। প্রবোধচন্দ্র সেন 'দল' এবং অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় 'অক্ষর' শব্দ Syllable অর্থে ব্যবহার করেছেন। 'অক্ষর' শব্দটি যেহেতু Letter অর্থে অনেকে ব্যবহার করেন তাই আমরা এরপর 'দল' শব্দটিই ব্যবহার করব। দল গঠনগত দিক থেকে দু'প্রকার — ১) মুক্তদল (Open Syllable) ২) রুদ্ধদল (Closed Syllable)। যে দলের শেষে মুক্ত বা পূর্ণস্বর থাকে তা মুক্তদল। যেমন — 'শেফালি' শব্দটিতে শে. ফা. লি এই তিনটি দল আছে এবং প্রতিটি দলের শেষে একটি করে মুক্ত বা পূর্ণস্বর আছে। তাই তিনটি দলই মুক্ত। যে দলের শেষে খণ্ডবর্ণ থাকে তা হল রুদ্ধদল। যেমন — 'চন্দন' শব্দটিতে চন্. দন্. এই দুটি দল আছে এবং উভয় দলের শেষে খণ্ডবর্ণ থাকায় এরা রুদ্ধদল। দলের এই ভাগ প্রবোধ চন্দ্রের। অমূল্যধন দলকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন — ১) মুক্তস্বরান্ত ২) যৌগিক স্বরান্ত ৩) ব্যঞ্জনান্ত। কিন্তু বস্তুতপক্ষে দল দু'প্রকার।

কারণ ছন্দের মাত্রা নির্ণয়ের সময়ে যৌগিক স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত অক্ষরের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয় না। মুক্তস্বরান্ত অক্ষর মুক্তদল এবং যৌগিক স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর রুদ্ধদলের পর্যায়ভুক্ত। দলকে উচ্চারণের দিক থেকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ১) হ্রস্বদল ২) দীর্ঘদল। মুক্ত রুদ্ধ নির্বিশেষে যে দল সংক্ষিপ্ত রূপে উচ্চারিত হয় তা হ্রস্বদল এবং যে দল প্রসারিতরূপে উচ্চারিত হয় তা দীর্ঘদল। হ্রস্বদল সবসময় একমাত্রা এবং দীর্ঘদল দু'মাত্রা পায়। মনে রাখতে হবে, একটি দলে মুক্ত ও যৌগিক, একটি মাত্র স্বর থাকবে।

একটি হ্রস্বদলের সমপিরমাণ ধ্বনিকে **'কলা'** (Mora) বলে। হ্রস্বদল এক কলামাত্রা এবং দীর্ঘদল দু'কলা মাত্রা পায় কলাবৃত্ত ও মিশ্রকলাবৃত্ত রীতির ছন্দে। কবিতায় ধ্বনি পরিমাপের আদর্শ মান হল মাত্রা (Unit of measure)। যে ক্ষুদ্রতম বস্তুর দ্বারা বৃহত্তর বস্তুর পরিমাণ নির্ণয় করা হয় তাকে বলে মাত্রা। যেমন কিলোমিটারের মাত্রা মিটার, মিটারের মাত্রা মিলিমিটার। বাংলা ছন্দে ধ্বনি পরিমাপের ক্ষুদ্রতম মাত্রা দু'রকম — দলমাত্রা ও কলামাত্রা।

কবিতা রচনায় বিভিন্ন ধরনের ধ্বনিবিন্যাস প্রণালীকে বলা হয় **'রীতি'** (Style)। বাংলা ছন্দে ধ্বনি বিন্যাস ঘটে তিনটি স্বতন্ত্র প্রণালীতে। ফলে মাত্রাগণনাও করা হয় তিনটি স্বতন্ত্র প্রণালীতে। এই তিনটি প্রণালীকে বাংলা ছন্দের তিনটি রীতি বলা হয়। যেমন : ১) একটি রীতিতে সাধারণভাবে মুক্ত ও রুদ্ধদল সবই অপ্রসারিতরূপে উচ্চারিত হয় এবং একমাত্রা পায়। এতে দলকে মাত্রারূপে ধরা হয়েছে। এই রীতিকে বলা হয় দলবৃত্ত (Syllabie) যেমন — বিরল তোমার / ভবনখানি / পুষ্পকানন / মাঝে — এই পংক্তিতে প্রথম তিন পর্বে চার মাত্রা এবং শেষ পর্বে দুই মাত্রা — মোট চোদ্দ দলমাত্রা আছে। ২) আর একটি রীতিতে মুক্তদল সংক্ষিপ্ত রূপে উচ্চারিত হয় ও একমাত্রা পায় এবং সব রুদ্ধদল প্রসারিতরূপে উচ্চারিত হয় এবং দুমাত্রা পায়। এই রীতিকে বলা হয়েছে কলাবৃত্ত (Moric)। যেমন — সন্ধ্যা-আকাশে / স্বর্ণ-আলোকে / পড়িবে ঢাকা — এখানে আছে প্রথম দুটি পর্বে ছ'টি করে মাত্রা, শেষ পর্বে পাঁচমাত্রা — মোট সতেরো কলামাত্রা। ৩) তৃতীয় রীতিতে মুক্তদল সবসময় হ্রস্ব হয় ও একমাত্রা পায়। শব্দের প্রান্ত ও একক রুদ্ধদল সর্বদা দীর্ঘ উচ্চারিত হয় ও দু'মাত্রা পায়। শব্দের অপ্রান্ত্য রুদ্ধদল সাধারণত হ্রস্ব হয় এবং একমাত্রা পায়। এখানেও কলাকে মাত্রা ধরা হয়েছে। এই রীতিতে যেহেতু রুদ্ধদল কখনও একমাত্রা কখনও দু-মাত্রা পায় তাই এই রীতির নাম মিশ্রকলাবৃত্ত বা মিশ্রবৃত্ত (Composite)। যেমন — এই সূর্যকরে এই / পুষ্পিত কাননে। — এই পংক্তিতে প্রথমভাগে আট এবং দ্বিতীয় ভাগে ছয় মোট চোদ্দ কালামাত্রা আছে। লক্ষ করা যায় মুক্তদল তিনটি রীতিতেই সর্বদায় একমাত্রা। রুদ্ধদল কলাবৃত্ত রীতিতে সব সময় দু'মাত্রা এবং মিশ্র কলাবৃত্ত রীতিতে শব্দের শেষে থাকলে দু'মাত্রা, প্রথমে বা মধ্যে থাকলে একমাত্রা হয়। যেমন 'অঞ্জন' শব্দটিতে (অন. জন) দুটি দল আছে। শব্দটি দলবৃত্তে দুই, কলাবৃত্তে চার এবং মিশ্রকলাবৃত্তে তিন মাত্রা পাবে। তিনটি রীতির এই নামগুলি প্রবোধচন্দ্র সেন প্রদত্ত। পূর্বে তিনি এদের নাম দেন যথাক্রমে স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত। অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় এই তিনটি রীতির নাম দেন যথাক্রমে, শ্বাসঘাত প্রধান, ধ্বনিপ্রধান ও তানপ্রধান। এছাড়াও এই তিনটি রীতির নাম বিভিন্ন সময়ে নানাজনে দিয়েছেন। যেমন, রবীন্দ্রনাথ — বাংলা প্রাকৃত, সাধু নূতন ও সাধু পুরাতন; দ্বিজেন্দ্রলাল — মাত্রিক, মিতাক্ষর নূতন ও মিতাক্ষর পুরাতন; সত্যেন্দ্রনাথ — চিত্রা, হৃদ্যা ও আদ্যা।

কোনো কবিতা দ্রুতগতিতে, কোনটা মধ্যম গতিতে, আবার কোনো কবিতা ধীর গতিতে পড়তে হয়। কবিতা পাঠের এই গতিকে বলা হয় 'লয়'। দলবৃত্ত রীতির কবিতা দ্রুত, কলাবৃত্ত মধ্যম এবং মিশ্রকলাবৃত্ত ধীর গতিতে পড়া হয় বলে সংখ্যাগুরু ছান্দসিকরা মনে করেন। বাংলা ছন্দের তাই তিনটি লয়। যথা — দ্রুত, মধ্যম ও ধীর। ড: রামবহাল

তেওয়ারী 'ছন্দ পরিচয়' গ্রন্থে মিশ্রকলাবৃত্তকে মধ্যম এবং কলাবৃত্তকে ধীর লয়ের ছন্দ বলেছেন। তাঁর বক্তব্য প্রনিধানযোগ্য কারণ যখন রুদ্ধদলকে প্রসারিত করে উচ্চারণ করা হয় তখন সময় বেশি লাগে এবং মাত্রাও বাড়ে অর্থাৎ পাঠের গতি কমে। মিশ্রকলাবৃত্ত রীতিতে রুদ্ধদল কখনো প্রসারিত কখনো সঙ্কুচিতভাবে উচ্চারিত হয়। অন্যদিকে কলাবৃত্ত রীতিতে রুদ্ধদল সর্বদায় প্রসারিতভাবে উচ্চারিত হয়। তাই কলাবৃত্ত ধীর এবং মিশ্রকলাবৃত্তের লয় মধ্যম বলেই মনে হয়। কিন্তু প্রবোধচন্দ্র সেন 'কোনো একটি লয়কে' কোনো একটি রীতির বৈশিষ্ট্য ধরতে চাননি।

কবিতা পাঠের সময় প্রতিটি পর্বের প্রথমে পড়ে ঝোঁক, আর শেষে পড়ে বিরতি। বিরতির মাধ্যমে ঝোঁকের বেগের সমাপ্তি ঘটে। এই ঝোঁকের নাম **'প্রস্বর'** (accent)। কবিতা এক নিঃশ্বাসে পড়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়, নিঃশ্বাস ফেলার জন্য বিরতি দিতে হয়। এই বিরতি কবিতায় দিতে হয় নির্দিষ্ট সময় অন্তর। গদ্যেও বিরতি থাকে কিন্তু তা পড়ে ভাব অনুযায়ী অনিয়মিত। নির্দিষ্ট সময় অন্তর কবিতায় যে বিরতি দেওযা হয় তাকে বলে **'যতি'**। আর গদ্যের বিরতিকে বলে **'ছেদ'**। মনে রাখতে হবে গদ্যছন্দে বিরতি দেওয়া হয় ভাব অনুযায়ী। ছেদের অন্য নাম **'ভাবযতি'**। গদ্যছন্দ ব্যতিরেকে অন্যান্য কবিতাতেও ছেদচিহ্ন ব্যবহৃত হয় অর্থ বা ভাবকে পরিস্ফুট করার জন্য। কবিতায় যতির গুরুত্ব বেশি। তাহলে কবিতায় নির্দিষ্ট সময় অন্তর বিরতি হল যতি, আর গদ্য ও পদ্যে অর্থ অনুযায়ী বিরতি হল ছেদ। যতিকে প্রবোধ চন্দ্র সেন পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা — অনুযতি বা দলযতি, উপযতি বা উপপর্বযতি, লঘুযতি বা পর্বযতি, মধ্যযতি বা পদযতি এবং পূর্ণযতি বা পংক্তিযতি। দলের পর অনুযতি, উপপর্বের পর উপযতি, পর্বের পর লঘুযতি, পদের পর মধ্যযতি এবং পংক্তির শেষে পূর্ণযতি পড়ে। ছন্দনির্ণয়ের ক্ষেত্রে লঘুযতির গুরুত্ব যথেষ্ট, তবে মধ্যযতি এবং পূর্ণযতির গুরুত্ব আরও বেশি।

'চন. দ্র ঃ য. খন / অস্. তে ঃ নামি. ল // ত.খ. নো ঃ র. য়ে. ছে / রা. তি।' এখানে একটা ফুটকি (.) দিয়ে অনুযতি, দুটি ফুটকি (ঃ) দিয়ে উপযতি, বাঁকা একটা দাগ (/) দিয়ে লঘুযতি, বাঁকা দুটি দাগ (//) দিয়ে মধ্যযতি এবং শেষে দাঁড়ি (।) দিয়ে পূর্ণযতির অবস্থান দেখানো হল। পূর্ণযতির স্থানে সব থেকে বেশি সময়ের বিরতি দেওয়া হয়, তবে তার থেকে কম সময় দেওয়া হয় মধ্যযতিতে, লঘুযতির ক্ষেত্রে তার থেকেও কম। অনুযতি ও উপযতি না দিলে দল ও উপপর্ব স্পষ্ট উচ্চারিত হবে না। পূর্ণযতির মাধ্যমে নির্দিষ্ট ধ্বনিসমূহকে পংক্তি, মধ্যযতি-নির্দিষ্ট ধ্বনি সমষ্টিকে পদ, লঘুযতি-নির্দিষ্ট ধ্বনিকে পর্ব, উপযতি-নির্দিষ্ট ধ্বনিকে উপপর্ব এবং অনুযতি-নির্দিষ্ট ধ্বনিখণ্ডকে বলে দল।

পর্ব তিন প্রকার — পূর্ণপর্ব, অপূর্ণপর্ব ও অতিপর্ব। পূর্ণপর্বগুলি পংক্তির প্রথমে ও মাঝখানে থাকে; আর অপূর্ণ পর্বগুলির মাত্রা পূর্ণপর্বের থেকে কম হয় এবং এগুলি থাকে পংক্তির শেষে, কখনো কখনো পদের শেষে। পূর্বের দৃষ্টান্তে 'রাতি' অপূর্ণ এবং বাকীগুলো পূর্ণপর্ব। কখনো কখনো পংক্তির প্রথমে ও মাঝখানে এমন কিছু শব্দ থাকে যার সঙ্গে কবিতার ছন্দের কোনো সম্পর্ক থাকে না, যা শুধু কবিতার ভাব-প্রকাশে সাহায্য করে তাকে বলা হয় অতিপর্ব। ১) 'ওগো, কে তুমি বসিয়া / উদাস মুরতি / বিষাদশান্ত / শোভাতে।' এই দৃষ্টান্তে 'ওগো' অতিপর্ব। (২) 'ভজন পূজন / সাধন আরাধানা / সমস্ত থাক / পড়ে। রুদ্ধদ্বারে / দেবালয়ের / কোণে / কেন আছিস / ওরে।' এখানে 'সাধন' ও 'কোণে' পংক্তির মাঝের অতিপর্ব। দুটি বা তিনটি পর্ব নিয়ে সাধারণত পদগুলি গঠিত হয়। মধ্যযুগের পয়ার এবং ত্রিপদী ছন্দোবন্ধে শুধু পংক্তিও পদ লক্ষ করা যায়, পর্ব দেখা যায় না; কারণ তখন কবিদের পর্বের ধারণা গড়ে ওঠেনি। তাই তাঁরা যাকে লঘু ত্রিপদী নামে অভিহিত করেছেন আধুনিককালের ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেনের বিচারে তা সঙ্গত কারণেই দ্বিপদী পংক্তি। যেমন —

'সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।'

এখানে ছ'মাত্রার তিনটি ও দু'মাত্রার একটি মোট চারটি পর্ব এবং দুটি পদ আছে। পূর্বে বলা হয়েছে পূর্ণযতি নির্দিষ্ট ধ্বনি সমষ্টিকে বলে পংক্তি। পংক্তির শেষে কখনো ছেদ পড়ে (পয়ার, ত্রিপদী), কখনো কখনো পড়ে না (অমিত্রাক্ষর, মুক্তক ও প্রবহমান পয়ার), কখনো একটি পংক্তির মধ্যেই ভাব পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় (পয়ার, ত্রিপদী), কখনো কখনো হয় না (অমিত্রাক্ষর, প্রবহমানপয়ার ও মুক্তক), মুক্তক ও গদ্যছন্দ ব্যতিরেকে অন্যান্য ছন্দোবন্ধে পংক্তি সমান হয়। একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চৌপদী — এই চার প্রকার পঙ্‌ক্তি বাংলা কবিতায় লক্ষ করা যায়। Metrical Line বা verse-কে প্রবোধচন্দ্র পংক্তি এবং অমূল্যধন 'চরণ' নাম দিয়েছেন।

মোট চোদ্দ মাত্রার (৮+৬) দ্বিপদী পংক্তিকে পয়ার বলা হয়। কেউ কেউ অন্ত্যমিলযুক্ত চোদ্দ মাত্রার (৮+৬) দ্বিপদী দুটি পংক্তিকে পয়ার বলেছেন। পয়ারের নানা রূপ— মহাপয়ার, প্রবহমান অন্তমিলযুক্ত ও অন্তমিলহীন পয়ার ও মহাপয়ার। আঠারো মাত্রার (৮+১০) দ্বিপদী পংক্তি হল মহাপয়ার। যে পয়ারে ভাব একটি পংক্তি থেকে অপর পংক্তিতে প্রবাহিত হয় তা প্রবহমান পয়ার। প্রবহমান মহাপয়ার একই বস্তু, শুধু চারমাত্রা বেশি থাকে। তিনটি পদযুক্ত পংক্তি ত্রিপদী। ত্রিপদী দু'রকম — লঘুত্রিপদী (৬+৬+৮ মোট ২০ মাত্রার) ও দীর্ঘত্রিপদী ((৮+৮+১০ মোট ২৬ মাত্রার)। চারটি পদ নিয়ে গঠিত পংক্তি চৌপদী। চৌপদীও দু'প্রকার — লঘু চৌপদী (৬+৬+৬+৫= ২৩) মাত্রার এবং দীর্ঘ চৌপদী (৮+৮+৮+৬= ৩০ মাত্রার)। একাবলী ৬+৫= ১১ মাত্রার এবং দিগক্ষরা ১০+১০= ২০ মাত্রার। এর মধ্যে লঘুত্রিপদী ও লঘুচৌপদী বর্তমানে রচিত হয় না। লঘুত্রিপদী যেমন আধুনিক বিচারে দ্বিপদী তেমনি লঘুচৌপদীও দ্বিপদী পংক্তি। যেমন —

'চিরসুখীজন / ভ্রমে কি কখন // ব্যথিতবেদন / বুঝিতে পারে?
কি যাতনা বিষে / বুঝিবে সে কিসে // কভু আশীবিষে / দংশেনি যারে।

এই পংক্তি দুটিকে প্রাচীন ধারায় চৌপদী বলা হয়।

প্রকৃত ত্রিপদী — কোথায় কবে / আছিলে জাগি, //
বিরহ তব / কাহার লাগি //
কোন্ সে তব / প্রিয়া। // কলাবৃত্ত — ১০+১০+৭, পর্ব ৫ ও ২ মাত্রা।

প্রকৃত চৌপদী — ভাবে বুঁদ হয়ে, / বুদবুদে ভরা, /
বাসনার রঙে / রাঙা রঙ্ করা, //
নীর নাহি যায় / বহ্নির প্রায় // সুরায় পড়গো / ঢুলি; (অঘোর-পন্থী)
কলাবৃত্ত — ১২+১২+১২+৮, পর্ব ৬ ও ২ মাত্রা।

আমরা তাই এখন শুধু ত্রিপদী ও চৌপদী শব্দদুটিই ব্যবহার করব। এ প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলা দরকার। একটি পর্ব এবং দুটি পর্ব নিয়ে গঠিত একপদী পংক্তিও লক্ষ্য করা যায়। যেমন —

১। এক পর্বের একপদী পংক্তি, ২। দুই পর্বের একপদী পংক্তি,

কলাবৃত্ত, ৪ মাত্রার পর্ব	কলাবৃত্ত, ৪ মাত্রার পর্ব, ৮ মাত্রার পদ
বায়ু বয়	কালোরাতি / গেল ঘুচে
বন ময়।	আলো তারে দিল মুছে।
বাঁশ গাছ	পূব দিকে / ঘুম ভাঙা
করে নাচ।	হাসে ঊষা / চোখ রাঙা।
— সহজ পাঠ, প্রথম ভাগ।	— সহজ পাঠ, দ্বিতীয় ভাগ।

একটি কবিতায় একটি ভাব প্রকাশিত হয়। কিন্তু সেই ভাবের একাধিক স্তর থাকে অনেক ক্ষেত্রে। সেই স্তরগুলিকে কবিরা যখন একাধিক প্রণালীবদ্ধ পংক্তি সমাবেশের মাধ্যমে প্রকাশ করেন তখন তাকে শ্লোকবন্ধ বা স্তবক বলে। প্রণালীবদ্ধ পংক্তি সমাবেশ বলতে বোঝায় একটি স্তবকের অন্তর্গত পংক্তিগুলির মধ্যে অন্তরঙ্গে ভাবের এবং বহিরঙ্গে আঙ্গিকের বন্ধনকে। গঠনের দিক থেকে একটি স্তবক যেমন হবে পরবর্তী স্তবকগুলিও ঠিক তেমনি হবে। তবে পংক্তিগুলি যে সমান হবে এমন কোনো কথা নেই। একই ধরণের দুটি পংক্তির সমাবেশকে যুগ্মক (Cuplet) বলে। একইভাবে তিন ও চার পংক্তির সমাবেশকে যথাক্রমে ত্রিক (triplet) ও চতুষ্ক (quartet) বলে। চারের বেশি পংক্তি নিয়ে গঠিত শ্লোককে বলে স্তবক (stanza)। পাঁচ, ছয়, সাত ও আট পংক্তির স্তবকের নাম যথাক্রমে পঞ্চক (quitet), ষট্‌ক (sestet), সপ্তক (heptet) এবং অষ্টক।

স্তবকের কয়েকটি দৃষ্টান্ত ঃ—

১) যুগ্মক (Cuplet) ঃ সপ্তকোটি সন্তানেরে হেমুগ্ধ জননী
রেখেছো বাঙালি করে মানুষ করোনি।

২) ত্রিক (triplet) ঃ নিত্য তোমার চিত্ত ভরিয়া স্মরণ করি,
অন্তবিহীন বিজনে বসিয়া বরণ করি;
তুমি আছ মোর জীবনমরণ হরণ করি — মানসী, ধ্যান।

৩) চতুষ্ক (quartet) ঃ হায় গো বন্ধু, সত্যসন্ধ — দুঃখের নেশাখোর।
বুঝিবে কি তুমি — এই জগতের সকলেই সুখ-চোর।
যার গানে আছে যত আনন্দ,
নৃত্য-চটুল চপল ছন্দ —
হয়ত সে দুখী সব চেয়ে, তার দুঃখের নাহি ওর,
ফাঁসীর কয়েদী ওজনে বাড়িছে — ধন্য সে সুখ-চোর।
— হেমন্ত গোধূলী, দুঃখের কবি।

(২)

এবার আমরা তিনটি রীতির ছন্দের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করব। প্রথমে দলবৃত্ত রীতির কথা। লোকসাহিত্যে

দলবৃত্ত ছন্দের প্রচলন ছিল দীর্ঘকাল ধরে। রবীন্দ্রনাথই প্রথম এই ছন্দে লিখিত সাহিত্য অর্থাৎ কবিতা রচনা করে একে আভিজাত্য দান করেন। সংজ্ঞায় অনেক জিনিসের সব পরিচয় ধরা পড়ে না। তবু চেষ্টা করা গেল। যে ছন্দের প্রতি পর্বের প্রথমে প্রস্বর বা ঝোঁক পড়ে, পর্বগুলি হয় সাধারণত চার মাত্রার, মুক্ত-রুদ্ধ নির্বিশেষে প্রতিটি দল একমাত্রা পায় তাকে বলে দলবৃত্ত ছন্দ। সংজ্ঞাটিকে বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি পাওয়া যায়। ১) প্রতি পর্বের প্রথমে একটা প্রস্বর বা ঝোঁক পড়বে। ২) পর্বগুলি হয় চার দলমাত্রার। কোনো পর্বে চারের বেশি বা কম দল থাকলে যথাক্রমে সংক্ষিপ্ত বা প্রসারিত উচ্চারণের দ্বারা তাকে চার মাত্রায় এনে মাত্রা-সমতা বজায় রাখতে হয়। (৩) মুক্ত রুদ্ধ প্রতিটি দল একমাত্রা পায়। তবে পংক্তির শেষের অপূর্ণপর্বে যদি একটি মাত্র রুদ্ধদল থাকে তবে তা দু'মাত্রা পায়। অনেক সময় পদের শেষ রুদ্ধদল দু-মাত্রা পায়। ৪) প্রতি পংক্তিতে সাধারণতঃ দুই, তিন ও চারটি পর্ব থাকে। তবে পাঁচ ও ছয় পর্বের পংক্তিও লক্ষ্য করা যায়। ৫) একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী, চৌপদী, পয়ার, মহাপয়ার, মুক্তক ইত্যাদি ছন্দোবন্ধ এই রীতিতে রচিত হয়।

১। হায়রে কবে / কেটে গেছে // কালিদাসের / কাল,
পণ্ডিতেরা / বিবাদ করে // লয়ে তারিখ / সাল।
আপাতত / এই আনন্দে // গর্বে বেড়ায় / নেচে,
কালিদাস তো / নামেই আছেন // আমি আছি / বেঁচে। — ক্ষণিকা, সেকাল।
— এই দৃষ্টান্তে 'কাল' ও 'সাল' পংক্তির শেষের এই রুদ্ধদল দুটি দু'মাত্রা করে পেয়েছে।

২। চোদ্দ বছর / কদিনে হয় // জানিনে মা / ঠিক
'দণ্ডক বন' / আছে কোথায় // ঐ মাঠে কোন দিক।
— এখানে দ্বিতীয় পংক্তির প্রথম পর্বে দন. ডক. বন. এই তিনটি রুদ্ধদলের মাঝেরটি প্রসারিত হয়ে চার দলমাত্রা হয়েছে।

৩। বাইরে কেবল / জলের শব্দ / ঝুপ ঝুপ / ঝুপ
দস্যি ছেলে / গল্প শুনে // একেবারে / চুপ।
— এই উদাহরণের প্রথম পংক্তির তৃতীয় পর্বের 'ঝুপ ঝুপ' চারমাত্রা পেয়েছে।

৪। চলি চলি / পা পা // টলি টলি / যায়
গরবিনী / হেসে হেসে // আড়ে আড়ে / চায়।
প্রথম পংক্তির দ্বিতীয় পর্বের 'পা পা' চার মাত্রা পায় আমাদের উচ্চারণে।

৫। কত লোক যে / পালিয়ে গেল / ভয়ে
কত লোকের / মাথা পড়ল / কাটা।
এটা একটা দ্বিপদী পংক্তি। প্রথম পদের দ্বিতীয় পর্বের 'পালিয়ে' আমাদের উচ্চারণে 'পাল্‌য়ে' রূপ নিয়ে দুই

দলে পরিণত হয়েছে এবং দুই মাত্রা পেয়েছে।

৬। সন্ধ্যা তারা / উঠে অস্তে / গেল,
চিতা নিবে / এল নদীর / ধারে,
কৃষ্ণপক্ষে / হলুদবর্ণ / চাঁদ
দেখা দিল / বনের একটি / পারে — ক্ষণিকা, কবির বয়স।

এখানে দ্বিতীয় পংক্তির প্রথম পদের শেষরুদ্ধদল 'চাঁদ' দুইমাত্রা পেয়েছে। দুই ও তিন দলমাত্রার পর্ব রচনা করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। ছয় দলমাত্রার পর্ব দেখা যায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'আলেখ্য' (১৯০৭) কাব্যের কোনো কোনো কবিতায়। সাত দলমাত্রার পর্ব পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কোনো কোনো কবির রচনায়।

(৩)

কলাবৃত্ত ছন্দ দু'প্রকার — প্রাচীন কলাবৃত্ত ও আধুনিক কলাবৃত্ত। আধুনিক কলাবৃত্ত ছন্দের প্রবর্তক রবীন্দ্রনাথ। মধ্যযুগে ব্রজবুলি ভাষায় রচিত বৈষ্ণবপদে প্রাচীন কলাবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এই ছন্দে কবিতা রচনার ক্ষেত্রে কবিরা সংস্কৃতের অনুসরণে বাংলা স্বরকে হ্রস্ব ও দীর্ঘ — এই দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন, কিন্তু মাত্রা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সংস্কৃতছন্দের নিয়ম সেভাবে মেনে চলেননি।

ড. জীবেন্দ্র সিংহরায় প্রাচীন কলাবৃত্ত ছন্দের এই বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করেছেন —

১। আ, ঈ, ঊ, ঐ, ঔ, অনুস্বার ও বিসর্গযুক্ত অক্ষর, যুক্তব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী অক্ষর, চরণের (পংক্তির) শেষ অক্ষর, ব্যঞ্জনযুক্ত এ-কার, ও-কার দীর্ঘঅক্ষর বা দল এবং দু-মাত্রা পায় কিন্তু বিকল্পে হ্রস্ব উচ্চারিত হতে পারে এবং একমাত্রা পেতে পারে।

২। হ্রস্ব অক্ষর (স্বর) এক মাত্রা পায়, তবে বিকল্পে প্রয়োজনে দু'মাত্রা পেতে পারে।

উদাহরণ :

২ ১১ ১১১১ ২ ১১ ২২
১। হাথক / দরপন / মাথক / ফুল = ৪+৪+৪+৪
১১১১ ২১১ ১১১ ১ ২ ২
নয়নক / অঞ্জন / মুখক তা ম্বুল।। = ৪+৪+৪+৪
১১১১ ১১১১ ২১১ ২২
হৃদয়ক / মৃগমদ / গীমক / হার = ৪+৪+৪+৪
২ ১১ ১১১ ২১১ ২২
দেহক / সরবস / গেহক / সার।। = ৪+৪+৪+৪

মন্তব্য : দ্বিতীয় পংক্তির তৃতীয় ও চতুর্থ পর্ব একসঙ্গে উচ্চারিত হবে। 'তাম্বুল' শব্দের 'তাম্' দলের পর লুপ্তযতি পড়েছে। দুটি পর্বে মোট আট মাত্রা পেয়ে পংক্তির মাত্রাসমতা রক্ষা করেছে।

২ ১ ১ ২ ১ ১ ১১ ১১ ১১১১

২। কন্টক / গাড়ি ক / মল সম / পদতল = ৪+৪+৪+৪

২ ১১ ২১ ১ ২ ২

মঞ্জীর / চীরহি / ঝাঁপি = ৪+৪+৪+৪

২ ১ ১ ২ ২ ১ ১ ১১ ২ ১১

গাগরি / বারি / ঢারি করি / পীছল = ৪+৪+৪+৪

১১১১ ২ ১১ ২ ২

চলতহি / অঙ্গুলি / চাপি।। = ৪+৪+৪+৪

— গোবিন্দ দাস

মন্তব্য : পর্ব চারমাত্রার। ত্রিপদী পংক্তি। 'বারি'-র 'রি'; 'ঝাপি' ও 'চাপি'-র 'পি' দুমাত্রা এবং 'ঢারি'-র 'ঢা' একমাত্রা পেয়েছে।

যে ছন্দে ধ্বনিগুলি পূর্ণ উচ্চারিত হয়, তার অতিরিক্ত কোনো সুর সৃষ্টি হয় না, মূল পর্ব চার, পাঁচ, ছয় বা সাত মাত্রার হয়, প্রতিটি রুদ্ধদল সবসময় দু-মাত্রা এবং প্রতিটি মুক্তদল সবসময় এক মাত্রা পায়, তাকে আধুনিক কলাবৃত্ত ছন্দ (Simple Moric metre) বলে। এই ছন্দের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ —

১। প্রত্যেকটি ধ্বনি পূর্ণরূপে উচ্চারিত হয়, অতিরিক্ত কোনো তান বা সুর সৃষ্টি হয় না।

২। মূল পর্ব হয় চার, পাঁচ, ছয় বা সাত মাত্রার।

৩। মুক্তদল এক মাত্রা এবং রুদ্ধদল দু-মাত্রা পায়। তবে ব্যতিক্রম থাকে।

উদহরণ :

১ ১১ ১১ ১ ২ ১ ১ ২ ২ ২ ১১ ২

১। আমরা ডরি না / মৃত্যুরে কেউ // শব-শিব একা / কার। = ৬+৬+৬+২

১ ২ ১ ২ ২ ২ ১১ ১১১ ১১ ১ ২

জীবন-সুরায় / নিঃশেষ করি // দেখি যে তলানি / সার = ৬+৬+৬+২

— অঘোর পন্থী, মোহিত লাল

১ ১ ২ ২ ১১ ২ ২

২। বাঙালির প্রাণ, / বাঙালির মন, //

১১ ২ ১১ ১১ ২ ২

বাঙালির ঘরে / যত ভাই বোন //

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ১ ১১ ২

এ-ক হউক, / এ-ক হউক, / এ-ক হউক / হে ভগবান।

মন্তব্য : এখানে 'এ-ক' রুদ্ধদলটি তিন মাত্রা পেয়েছে।

(৪)

যে ছন্দে মূল পর্ব চার মাত্রার, মুক্তদল ও অপ্রান্ত রুদ্ধদল একমাত্রা, প্রান্ত ও একক রুদ্ধদল দু-মাত্রা পায় তাকে মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দ বলে। পাঁচ, ছয় ও সাত মাত্রার পর্ব কিছু দেখা যায়। এই ছন্দের শোষণশক্তি খুব বেশি। পদগুলি বড়ো বলে শব্দের আদি ও মধ্যস্থলে যুক্তাক্ষর বৃদ্ধির মাধ্যমে ধ্বনির পরিমাণ বাড়ালেও মাত্রাসংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে। রবীন্দ্রনাথ এটা দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়েছেন।

প্রবোধচন্দ্র সেন ৮ ও ১০ মাত্রার পর্ব মানতে চান নি। তাঁর মতে এগুলি প্রকৃতপক্ষে ৪+৪ ও ৪+৪+২ মাত্রার যথাক্রমে দুই বা তিন পর্বের পদ।

মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্য হল :

১। ধ্বনির অতিরিক্ত একটা সুর থাকে

২। শোষণ-ক্ষমতা বেশি।

৩। মুক্তদল এক মাত্রাপায়। প্রান্ত্য ও একক রুদ্ধদল দুই মাত্রারপায়। অপ্রান্ত্যরুদ্ধদল যদি তদ্ভব শব্দে অযুক্তাক্ষরে প্রকাশিত হয় তবে দুই মাত্রা অন্যান্য ক্ষেত্রে একমাত্রা পায়, তবে ব্যতিক্রম থাকে।

উদাহরণ :

১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ২

১। আমায় জা / নিলে আমি // আর নাহি / দায়, = ৮+৬

১ ১ ২ ২ ১১ ১ ১ ২ ২

অহং কার / বোধ হলে // অহংকার / যায়। = ৮+৬

— কে তুমি, ঈশ্বর গুপ্ত

— এখানে 'অহং' শব্দের 'হং' একমাত্রা পেয়েছে।

১১ ১ ১ ২ ১ ১

২। যত চাপিলাম মুঠি // = ৮

১ ১ ১১ ১১ ১১

পাপড়িগুলি গেল টুটি — // = ৮

১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ২

কান্না ওঠে, গান থেমে যায়। = ১০

এখানে একটি ত্রিপদী পংক্তি আছে। 'পাপড়ি' শব্দটি তদ্ভব হওয়া সত্ত্বেও এখানে 'পাপ' রুদ্ধদলটি একমাত্রা পেয়েছে।

(৫)

মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রথম পয়ারের বাঁধন ভেঙে বাংলা ছন্দের মধ্যে শুধু বৈচিত্র্যই সৃষ্টি করেননি ভাবপ্রকাশের

ক্ষমতাও বৃদ্ধি করতে সক্ষম হন। মিলটনের Blank Verse-এর অনুসরণে মিশ্রকলাবৃত্ত রীতির আধারে মধুসূদন সৃষ্ট এই ছন্দোবন্ধের নাম অমিত্রাক্ষর ছন্দ। মধুসূদন এই ছন্দের প্রথম প্রবর্তন করেন '**পদ্মাবতী**' নাটকে। পরে '**তিলোত্তমাসম্ভব**' ও '**মেঘনাদবধকাব্য**'-এ ছন্দের চরম উৎকর্ষ সৃষ্টি করেন। '**বীরাঙ্গনা**' কাব্য এই ছন্দে রচনা করে কবি প্রমাণ করেন গুরুগম্ভীর ভাবপ্রকাশই নয়, লঘু ভাবের প্রকাশেও তা সক্ষম। এই ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল — (১) পংক্তির শেষে যেখানে পূর্ণযতি পড়ে সেখানে পূর্ণছেদ পড়ার বাধ্যবাধকতা থাকল না অর্থাৎ সেখানে ভাব পূর্ণতা পেলে ছেদ পড়বে, আর তা নাহলে পড়বে না। পূর্ণছেদ পরবর্তী পংক্তিগুলির যে কোনো জায়গায় পড়বে। (২) এতে ভাবকে প্রতিটি পংক্তির মধ্যে প্রকাশ করার বাধ্যবাধকতাও থাকল না, তা একপংক্তি থেকে অন্যান্য পংক্তিতে প্রবাহিত হওয়ার সুযোগ পেল। অর্থাৎ ভাবের প্রবহমানতা সৃষ্টি হল। (৩) অন্ত্যমিল থাকল না। (৪) প্রতিটি পংক্তি ১৪ মাত্রার দ্বিপদী। (৫) মাত্রাগণনা মিশ্রকলাবৃত্তরীতির নিয়ম অনুযায়ী।

১। উতরি জলধিকলে, // পশিলা সুন্দরী = ৮+৬
নীল-অম্বু-রাশি। হেথা // কেশব-বাসনা = ৮+৬
পদ্মাক্ষী, চলিলা রক্ষঃ // কুল-লক্ষ্মী, দূরে = ৮+৬
যথায় বাসব-ত্রাস // বসে বীরমণি = ৮+৬
মেঘনাদ। শূন্যমার্গে // চলিলা ইন্দিরা। = ৮+৬

— এখানে পাঁচটি পংক্তি আছে। পূর্ণছেদ পড়েছে দ্বিতীয় পংক্তির মধ্যে এবং পঞ্চম পংক্তির মধ্যে ও শেষে। ভাব অবলীলায় এক পংক্তি থেকে অপর পংক্তিতে প্রবাহিত হয়েছে।

অমিত্রাক্ষরছন্দকে অন্ত্যমিলহীন প্রবহমান পয়ার বলে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ অন্ত্যমিলযুক্ত প্রবহমান পয়ার ও মহাপয়ার সৃষ্টি করে বাংলা ছন্দোবন্ধে আরও বৈচিত্র্য এনে বাংলা কাব্যকে উৎকর্ষ মণ্ডিত করেন।

(৬)

গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁর নাটকে অন্ত্যমিলহীন অসম পদ ও পংক্তির প্রবহমান মিশ্রকলাবৃত্ত রীতির এক ধরণের ছন্দোবন্ধ রচনা করেন যা 'গৈরিশছন্দ' নামে পরিচিত। কেউ কেউ একে 'ভাঙা' অমিত্রাক্ষরছন্দ বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ একে যথার্থ অমিত্রাক্ষরছন্দ বলেন। অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় এই ছন্দোবন্ধকে বলেন যথার্থ Fee Verse বা মুক্তক। এসব মত প্রণিধানযোগ্য। বাংলাছন্দের বন্ধন-মুক্তির একটি স্তরে গৈরিশছন্দের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তবে এই ছন্দ শুধু নাটকেই ব্যবহৃত হয়েছে, কবিতায় নয়। গৈরিশছন্দের বৈশিষ্ট্য —

১। রীতিতে মিশ্রকলাবৃত্ত।
২। মাত্রাগণনা মিশ্রবৃত্তের অনুরূপ।
৩। পঙ্‌ক্তি অসম, অন্ত্যমিলহীন ও পর্বগুলিও অসমান।
৪। ভাবের প্রবহমানতা বর্তমান।
৫। যতি নয়, ভাব অনুযায়ী ছেদ ব্যবহার হয়।

উদাহরণ :

গিরিধারী / নাহি বাহুবল তব = ৪+৮

চাহ বুঝাইতে / তোমা হতে আমি বলাধিক = ৬+১০
ক্ষত্রিয় সমাজে / কথা বটে সম্মান-সূচক = ৬+১০
ছল নহি আমি / অতিছল তুমি, = ৬+৬

(৭)

বাংলাছন্দের বন্ধন-মুক্তির ইতিহাসে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর প্রথম প্রয়াস। দ্বিতীয় প্রচেষ্টা গিরিশচন্দ্রের গৈরিশছন্দ। রবীন্দ্রনাথের মুক্তবন্ধ বা মুক্তক বা বলাকাছন্দ তৃতীয় স্তর। এই ছন্দোবন্ধের প্রথম ব্যবহার দেখা যায় 'মানসী' কাব্যের 'নিষ্ফল কামনা' কবিতায়। তবে তারও পূর্বে কিছু কবিতায় এর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন রবীন্দ্রনাথ। 'বলাকা' কাব্যেই এর প্রথম সার্থক ব্যবহার ব্যাপকভাবে দেখা যায়। এবং এটা একটা নতুন ধরনের ছন্দোবন্ধের মর্যাদা পায়। এই ছন্দোবন্ধের বৈশিষ্ট্য :

১। পংক্তিগুলি হবে অসমান সমিল বা অমিল।
২। ভাবের প্রবহমানতা থাকবে।
৩। তিনটি রীতিতেই এই ছন্দোবন্ধ রচিত হয়।
৪। মাত্রা নির্ণয় করা হয় রীতি অনুযায়ী।
৫। মিশ্রবৃত্ত রীতিতে পর্বগুলো অসমান হলেও কলাবৃত্ত ও দলবৃত্ত রীতিতে সমান পর্ব দেখা যায়।
৬। পর্বের মাত্রা হয় জোড় সংখ্যার (২, ৪, ৬, ৮, ১০)।

বলাকাছন্দে বা মুক্তক ছন্দোবন্ধ প্রকৃতপক্ষে গৈরিশছন্দের বৈচিত্র্যপূর্ণ রূপ যা বাংলাছন্দের ভার বহনের ক্ষমতা ও উৎকর্ষ বৃদ্ধি করেছে। বলাকা, পলাতকা, শ্যামলী, সেঁজুতি, পরিশেষ, পুনশ্চ, আকাশপ্রদীপ, আরোগ্য, জন্মদিনে প্রভৃতি কাব্যে এই ছন্দে রচিত কবিতা আছে।

উদাহরণ :

১। দলবৃত্ত রীতির সমিল মুক্তক
বিনর বয়স / তেইশ তখন // রোগে ধরল / তারে = ৪+৪+৪+২
ওষুধে ডা / ক্তারে = ৪+২
ব্যাধির চেয়ে / আধি হল / বড়ো = ৪+৪+২
নানা ছাপের / জমল শিশি // নানা মাপের / কৌটো হল / জড়ো। = ৪+৪+৪+৪+২

২। মিশ্রকলাবৃত্তের সমিল মুক্তক —
একদিন তরীখানা / থেমেছিল এই ঘাটে লেগে = ৮+১০
বসন্তের / নতুন হাওয়ার / বেগে। = ৪+৬+২
তোমরা শুধায়েছিলে / মোরে ডাকি, = ৮+৪
'পরিচয় কোনো / আছে নাকি, = ৬+৪

যাবে কোনখানে?' = ৬
আমি শুধু / বলেছি, 'কে জানে!' = ৪+৬
— পরিচয়, সেঁজুতি

(৮)

পয়ারের আঁটসাঁট বাঁধন ছিঁড়ে ছন্দোমুক্তির যে শুভসূচনা হয়েছিল অমিত্রাক্ষরে তা গৈরিশ ও মুক্তকের মধ্যদিয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তর পেরিয়ে পূর্ণতা পেয়েছে গদ্যছন্দে। এই ছন্দোবন্ধের স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ। **'লিপিকা'** (১৯২২) গ্রন্থে তিনি প্রথম কয়েকটি গদ্যকবিতা লিখেছিলেন, কিন্তু লজ্জায় ছাপানোর সময় বাক্যগুলিকে পদ্যের মতো খণ্ডিত করে সাজাননি। **'পুনশ্চ'** (১৯৩২) কাব্যে তিনি সরাসরি গদ্যছন্দে কবিতা লিখলেন। এরপর তিনি শেষসপ্তক, পত্রপুট, শ্যামলী, আরোগ্য, জন্মদিনে প্রভৃতি কাব্যে প্রচুর গদ্যকবিতা রচনা করে গদ্যছন্দ ও বাংলা কবিতার উৎকর্ষ সৃষ্টি করেছেন। গদ্যকবিতা এখন অত্যন্ত জনপ্রিয়। গদ্যে কোনো ছন্দ থাকে না। এখানেই পদ্যের সঙ্গে গদ্যের পার্থক্য। কিন্তু গদ্যকবিতা বা গদ্যছন্দে একটা সূক্ষ্ম স্পন্দন থাকে। প্রতিভাধর কবিরা গদ্যছন্দে প্রচুর উৎকৃষ্ট বাংলা কবিতা রচনা করেছেন।

<u>এই ছন্দের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :</u>

১। এই ছন্দোবন্ধ রচিত হয়েছে কেবলমাত্র মিশ্রকলাবৃত্ত রীতিতে।
২। মুক্ত ও অপ্রান্ত রুদ্ধদল এক এবং প্রান্ত্য ও একক রুদ্ধদল দু'মাত্রা পায়। সমাসবদ্ধ শব্দের পূর্বপদের প্রান্ত্যরুদ্ধদল কখনও কখনও দু'মাত্রা পায়।
৩। ভাবের প্রবহমানতা থাকে।
৪। কোথাও যতি পড়ে না। যেখানে ভাব পূর্ণতা পায় সেখানে পূর্ণছেদ এবং মাঝে অর্ধছেদ পড়ে।
৫। পংক্তির শেষে পূর্ণছেদ পড়ার বাধ্যবাধকতা নেই।
৬। পংক্তির শেষে অন্ত্যমিল থাকে না।
৭। পর্ব ও পংক্তিগুলি হয় অসমান।
৮। যে কোনো বিষয় নিয়ে এই ছন্দোবন্ধে কবিতা লেখা যায়।
৯। শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে গদ্যপদ্যের সীমারেখা টানা হয় না।
১০। মম, তব, তরে, সনে, মোর, হেথা প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয় না।
১১। পর্ব ভাগ করা হয় ভাব অনুযায়ী।
১২। পর্বের মাত্রা সংখ্যা জোড় ও বিজোড় যে কোনো রকম হতে পারে।

উদাহরণ :

অমলার মা যখন / গেলেন মারা ৮+ ৫= ১৩
তখন ওর বয়স ছিল / সাত বছর। ১০+ ৫= ১৫
কেমন একটা / ভয় লাগল মনে ৬+ ৭= ১৩
ও বুঝি বাঁচবে না / বেশিদিন। ৭+ ৪= ১০

কেননা, / বড়ো করুণ ছিল / ওর মুখ,	৩+ ৭+ ৪= ১৪
যেন / অকালবিচ্ছেদের ছায়া	২+ ৯= ১১
ভাবী কাল থেকে / উলটে এসে পড়েছিল	৬+ ৯= ১৫
ওর বড়ো বড়ো / কালো চোখের উপরে।	৬+ ৮= ১৪
সাহস হত না / ওকে সঙ্গছাড়া করি।	৬+৮= ১৪
কাজ করছি / অফিসে বসে,	৫+ ৫= ১০
হঠাৎ হত মনে	= ৭
যদি কোনো / আপদ ঘটে থাকে।।	৪+ ৭= ১১

এই স্তবকে আছে বারোটি পংক্তি। পূর্ণছেদ পড়েছে দ্বিতীয়, চতুর্থ, অষ্টম, নবম ও দ্বাদশ পংক্তির শেষে। অর্ধছেদ পঞ্চম ও দশম পংক্তির শেষে। ভাবের প্রবহমানতা আছে। পংক্তিগুলি অসমান। পর্বগুলি অসমান এবং জোড় ও বিজোড় মাত্রা-সংখ্যার। অর্থাৎ ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ এবং ১০ মাত্রার পর্ব এখানে দেখা যায়।

বাংলাছন্দ নিয়ে প্রবন্ধ লেখার মূল লক্ষ্য ছিল ছন্দ সম্পর্কে বিভিন্ন মতের সমন্বয়সাধন এবং যেখানে তা করা সম্ভব নয় সেখানে একাধিক মতকে এক জায়গায় তুলে ধরা যাতে তা পাঠক, বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীরা অনায়াসে দেখতে পায়। ছন্দের বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা সেগুলি দেখানোর চেষ্টা করেছি। উপসংহারে সেগুলোকে একজায়গায় স্পষ্ট করে দেখানো হল।

চরণ ও পংক্তি শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে আমরা **'পংক্তি'** শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী। Metrical Line বা verse কে বা পূর্ণযতি নির্দিষ্ট ধ্বনিগুচ্ছকে চরণ বা পংক্তি বলেছি। ছন্দনির্ণয়ের মূল বৈশিষ্ট্য লয় নয়, মাত্রা। প্রবোধচন্দ্র সেন কোনো একটি লয়কে কোনো একটি রীতির বৈশিষ্ট্য বলে মানতে নারাজ। আমরা লক্ষ্য করেছি প্রাচীন রীতিতে যাকে ত্রিপদী ও চৌপদী বলা হয় আধুনিক বিচারে তা দ্বিপদী। পয়ার সম্পর্কে দুটো মতই আমরা তুলে ধরেছি। কেউ কেউ কলা ও মাত্রাকে এক ও অভিন্ন বলেছেন। এ মত প্রণিধানযোগ্য। মিশ্রকলাবৃত্ত রীতিতে আট ও দশ মাত্রার যতি বিভাগকে প্রবোধচন্দ্র **'পদ'** বলেছেন — এ মত গ্রহণযোগ্য। প্রবন্ধের আয়তনের কথা মাথায় রেখে প্রতিটি বিষয়ের উদাহরণ দেওয়া থেকে বিরত থেকেছি। ছন্দের আরও অনেক বিষয় আলোচনার বাইরে থেকে গেল। প্রবন্ধান্তরে তা আলোচনার ইচ্ছে রইল।

ঋণস্বীকার :

১। বাংলা ছন্দের মূলসূত্র — অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়।

২। নূতন ছন্দ পরিক্রমা — প্রবোধচন্দ্র সেন।

৩। বাঙলাছন্দ — ড. জীবেন্দ্র সিংহ রায়।

৪। ছন্দ পরিচয় — ড. রামবহাল তেওয়ারী।

৫। নব ছন্দশৈলী — ড. সুধাংশুশেখর শাসমল।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নারীচেতনা

ডঃ হেনা সিনহা
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

নারীবাদ এবং জেন্ডারতত্ত্ব দুটি ধারণারই জন্ম আধুনিককালে। নারীবাদী আন্দোলন থেকে পরবর্তীকালে জেন্ডার প্রত্যয়টির উদ্ভব ঘটে। নারীবাদ কী? মল্লিকা সেনগুপ্তের ভাষায় - ''নারীবাদ মানে প্রশ্ন তোলা, অবিরাম প্রশ্ন। পক্ষপাতের বিরুদ্ধেই নারীবাদ প্রশ্ন তোলে। সেই প্রশ্ন শুধু যৌন-মূল্যবোধের ক্ষেত্রেই নয় সর্বক্ষেত্রে।''[১] নারীর সপক্ষে ও লিঙ্গাশ্রয়ী বঞ্চনার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়াই নারীবাদের মূল কথা। নারীবাদ-সংক্রান্ত লেখালেখির শুরু প্রায় সাড়ে তিনশো বছরেরও আগে, ১৬৩০ খ্রিস্টাব্দে। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের ২৭ আগস্ট ক্লারা জেটকিনের নেতৃত্বে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক নারী আন্দোলন হয়। সমাজে প্রথম ব্যাপক পরিবর্তন ঘটল শিল্পবিপ্লবের পর। ক্রমে স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হল। তখন আমেরিকায় প্রবলভাবে চলছে নারীদের অধিকার অর্জনের লড়াই। নারীরা রাজনীতি, সমাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে চাইছে, গৃহবন্দিত্বের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে। তার প্রভাব পড়েছে সর্বত্র। নারীরা অর্থনৈতিক অধিকার, সম্পত্তি, শিক্ষা, বিবাহ-বিচ্ছেদের, সন্তানের অভিভাবকত্বের ও ভোটাধিকার দাবি করেছে। এইভাবে পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে ও লিঙ্গ-বৈষম্যের প্রতিবাদে নারীরা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেদের যথাযথ মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে।

নারীবাদ যেমন তত্ত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, জেন্ডার তত্ত্বও তাই। জেন্ডার বলতে বোঝায় নারী-পুরুষের সামাজিক সম্পর্ককে। যেহেতু প্রকৃতিগত কারণে নারী-পুরুষের সম্পর্ক সমান নয়, তাই জেন্ডারের লক্ষ্য হল এই সম্পর্কের মাত্রাটি কেমন তা ধরিয়ে দেওয়া, বিশ্লেষণ করা। এই বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে দেখা যায় নারী ও পুরুষের সম্পর্ক বিরোধাত্মক হয়ে আছে, পরস্পর বিপরীত প্রান্তে তাদের অবস্থান। পুরুষ গণ্য হয় মূল বা কেন্দ্র হিসেবে, নারীর অবস্থান ধরা হয় প্রান্ত হিসেবে। নারীবাদ এই বিরোধের ছবিটাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে; নারী পুরুষের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে তাতে নারীর অবস্থান কোথায় তা নির্দেশ করে দেখিয়ে দিতে চায়। পক্ষান্তরে জেন্ডার নারী-পুরুষের যে সামাজিক-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে সেই সম্পর্ককে বিশ্লেষণ করে নারী-পুরুষের সম্পর্ককে সহজ ও সমান পর্যায়ে তুলে আনতে চায়।[২]

আজ আমরা একুশ শতকের শূন্য দশক অতিক্রম করে প্রথম দশকের মধ্যভাগের উপনীত; যখন নারীবাদ ও জেন্ডার তত্ত্ব বিষয়ক আন্দোলন ও আলোচনা অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। এই সময়ে দাঁড়িয়ে প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যকে কোনো আধুনিক তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না, তা সমীচীনও নয়। সেই কষ্ট-কল্পনা না করে প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে নারীর অবস্থান কেমন ছিল সেদিকটির প্রতি আলোকপাত করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনযুগ থেকেই নারী-পুরুষের প্রসঙ্গ বিভিন্নভাবে ধরা পড়েছে। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ যদিও ধর্মীয় সাধন সংগীত; তবুও এর পদগুলির মধ্যদিয়ে বিবৃত হয়েছে সমসাময়িক কালের বাস্তব সমাজ। এই সমাজের ছবি আঁকতে গিয়েই চর্যাপদকারগণ নারী-পুরুষের বিশেষকরে নারী-জীবনের কিছু প্রসঙ্গ তুলে এনেছেন। চর্যায় আমরা বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত নারীদের কথা পাই। ডোমনী নামক নিম্নশ্রেণির এই মেয়েদের

কেউ কেউ তাঁত বিক্রি করত, বিক্রির জন্য চাঙারি তৈরি করত, গণিকাবৃত্তিতেও নিযুক্ত হতো। শুন্ডিনীরা মদ চোলাই করত এবং তাদের দুয়ারে বিশেষ চিহ্ন দেখে লোক সেখানে যাওয়া-আসা করত। ডোমনীদের অবস্থান ছিল নগরের বাইরে। ব্রাহ্মণেরা অবশ্য তাদের সংস্পর্শে আসতেন।

''নগর বাহিরে ডোম্বি তোহোরি কুড়ি আ।
ছোট ছোট জাসি বাহ্মন নাড়ি আ।।
আলো ডোম্বি তো এ সম্ করিব মই সাঙ্গ।
নিঘিন কাহ্ন কাপালি জোইলাঙ্গ।।''

নারীর পরিসর এখানে সংকুচিত হয়ে গেছে। আর তাই ডোম্বির বাস ছিল নগরের বাইরে, মূল জনপদ থেকে দূরে। ব্রাহ্মণেরা অবশ্য যৌনলালসা তৃপ্ত করার জন্য তাদের সংস্পর্শে এসেছে। 'আলো ডোম্বি' এই সম্বোধনের মধ্যেও নিহিত আছে অবজ্ঞা। সমীহ সূচক কোনো সম্বোধন নয়, নারীর জন্য তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ভাষা অনায়াসে যেন ব্যবহার করা যায় এবং নির্দ্বিধায় বলা যায় 'সাঙ্গা' করার কথাও। নৃত্য-গীত-বাদ্য ও অভিনয়কলার সঙ্গেও নারীরা যুক্ত থাকত, সুকুমারকলার চর্চা নারীরাই করত, তবে এসব বৃত্তি নিন্দনীয় ছিল। এসব সত্ত্বেও অভাব ছিল তাদের নিত্যসঙ্গী। প্রতিবেশীহীন নিঃসঙ্গ জীবনের দুঃসহ যন্ত্রণা আর অভাবের কষ্ট সহ্য করেছে নারী —

''টালত মোর ঘর নাহি পড়বেসী।
হাড়িতে ভাত নাহি নীতি আবেশী।''

সিমোঁ দ্য বোভেয়ার যেমন বলেছেন পুরুষতন্ত্র নারীর-যৌনজীবনকে আত্মসাৎ করেছে। চর্যাপদেও নারীর যাপিত জীবনে তারই প্রতিফলন লক্ষণীয়।

চর্যাপদের পর প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। এ কাব্যের আধ্যাত্মিকতার আবরণ সরিয়ে নিলে সেকালের বাংলা ও বাঙালির বিশেষত বাঙালি নারীর সামূহিক ছবিটি আমাদের চোখে প্রতীয়মান হয়। এখানে চর্যাপদের তুলনায় নারীর বন্ধন কিছুটা শিথিল। আলোচ্য কাব্যের প্রধান চরিত্র রাধা। এ রাধা শ্রমজীবী নারী; একান্তভাবে বাংলার জল-মাটি থেকে উঠে আসা সাধারণ বাঙালি নারী। রাধাকে যমুনা নদী পার হয়ে মথুরার হাটে গিয়ে দুই-দই বিক্রি করতে দেখি। এখানে রাধার উপস্থিতি কিছুটা ইতিবাচক; গৃহবধূ হয়েও সে গৃহের বাইরে পা রাখার সুযোগ পেয়েছে, তার বিচরণের পরিসর চর্যাপদের ডোম্বিনীদের মতো ততটা সংকুচিত নয়। দধি-দুধ বিক্রির অর্থ ব্যয় করার কোনো ক্ষমতা রাধার ছিল কিনা - তার কোনো উল্লেখ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পাওয়া যায় না। এই অনুল্লেখ থেকে অনুমান করা যায় হয়তো পুরুষই ছিল অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক।

রাধা গৃহের বাইরে আসার সুযোগ পেলেও তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে বড়ায়িকে। সুতরাং ঘরের বাইরে নারীর জীবন নিরাপদ ছিল না। এই নিরাপত্তাহীনতার ছবি ফুটেছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের প্রথম দিকে; যখন শ্রীকৃষ্ণ প্রেমনিবেদনের নামে বিভিন্ন রকমভাবে রাধাকে উত্যক্ত করেছে। কখনো জলে ডুবিয়েছে, কখনো দানী সেজে তার সর্বস্ব নিতে চেয়েছে, কখনও বা মদনবাণ নিক্ষেপ করেছে। কাব্যটি ধর্মীয় সাহিত্য না হলে যৌনরাজনীতির উৎকট প্রকাশের জন্য যৌনপীড়নের দলিল হিসেবে নিঃসন্দেহে পরবর্তীকালে নিন্দিত হতো। ধর্মীয় বাতাবরণের মধ্য দিয়ে চিত্রিত জীবনের ছবিটিই গুরুত্বপূর্ণ। নারীর উপর পুরুষের প্রবল আধিপত্য বিস্তারের এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন এই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য।

একালের নারীর মতো সেকালের নারীওদেবতাপ্রতিম পুরুষ দ্বারা ধর্ষিতা হতো - দুর্বলনারী প্রবলের শিকার হতো। দানখন্ড-এর শেষাংশে রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের যে দেহমিলন ঘটেছে, তা কৃষ্ণের দিক থেকে বলাৎকার ছাড়া আর কি বলা যায়? হৃদয়ের সম্মতিহীন দেহমিলন রাধার মনে বিপন্নতা ও ঘৃণা জাগিয়েছে। অবশ্য কাব্যশেষে রাধার মানসিক রূপান্তর ঘটেছে। সে কৃষ্ণের প্রেমে সাড়া দিয়েছে। পুরুষতন্ত্রের নির্মম চেহারাটা আবারও উন্মোচিত হয়। রাধা যখন কৃষ্ণে পূর্ণ-সমর্পিত তখনই কৃষ্ণের মধ্যে ধর্মীয় কর্তব্যবোধ জেগে উঠেছে। কৃষ্ণ বৃন্দাবনে রাধাকে ফেলে রেখে কংসবধের জন্য মথুরায় চলে যায়। এখানেই আমরা পুরুষতন্ত্রের প্রকট রূপ লক্ষ করি। প্রজারক্ষা কৃষ্ণের কাছে বড়ো কাজ, নারী হয়ে গেল গৌণ, অপাংক্তেয়, যেন সে প্রজা নয়, তকে বঞ্চিত করা যায়, অবহেলা করা যায়। রাধার চোখের জলে কৃষ্ণের ফিরে আসার আশায় অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। আবারও এই অপেক্ষারও কোনো ইতিবাচক সমাপ্তি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ঘটেনি। অর্থাৎ চূড়ান্তভাবে রাধাকে অবহেলা করেছে কৃষ্ণ। শারীরিক ও মানসিক উভয়প্রকার নির্যাতনের জন্য কৃষ্ণ দায়ী। আধুনিক কালের নারীবাদীরা নারী নিপীড়নের এই দুটি দিকের উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে আরো একটি বিষয় লক্ষ করার মতো। এখানে রাধা শুধুমাত্র কৃষ্ণের নির্যাতনের শিকার হয়নি, তার স্বামী, এমনকি ননদিনীর কাছেও হয়েছে নিগৃহীত। ভ্রাতৃবধূর প্রতি ননদিনীর নিগ্রহ নারীবাদের সেই দিকটিকেই প্রকটিত করে যে পুরুষতন্ত্রকে অবচেতন বা সচেতনভাবে আত্মস্থ করে পুরুষের সঙ্গে নারীরাও পুরুষতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখে। পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে নারীও নারীর প্রতি নির্যাতন করে। রাধার বেলাতেও ঠিক এমনটাই ঘটেছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য-পর্যালোচনায় এটুকু বলা যায় যে সেকালের নারী আপন সত্তা কিংবা অস্তিত্বের মৃত্তিকা তখনো খুঁজে পায়নি। পুরুষের মনোরঞ্জনের উপায় হিসেবেই তারা চিত্রিত; নিজস্ব পরিচয় ও অস্তিত্ব প্রকাশে সমর্থ হয়নি।

বৈষ্ণব পদাবলি মধ্য-যুগের বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল সম্পদ। এটি মূলত রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা বিষয়ক কাব্য। নারীচরিত্র বলতে একমাত্র রাধাই উল্লেখযোগ্য। যশোদা, বৃন্দা, চন্দ্রাবলী, শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়া - এই পাঁচ নারীর কথা পাওয়া গেলেও এদের কেউই সমগ্রতা নিয়ে চিত্রিত হয়নি। পদাবলির নারীদের চিত্তলোকে একদিকে আছে অধ্যাত্মচেতনার রং, অন্যদিকে মাটির ঘরের লৌকিক রূপ। বস্তুত, রাধার অবয়বেই ভেসে ওঠে সেকালের বাঙালি নারীর সামূহিক রূপ। রাধার মধ্যদিয়ে ভেসে ওঠে চিরায়ত বঞ্চনার প্রতিভাস, নারীর দুঃখের ইতিহাস। ধর্মীয় প্রেরণায় সৃষ্টি হলেও, রাধা পুরুষতান্ত্রিকতার অসহায় শিকার। বস্তুত, রাধা বাঙালি নারীর চিরায়ত বঞ্চনা ও বিরহের সংহত রূপ।

প্রাগাধুনিক যুগের আর একটি বড়ো শাখা হল মঙ্গলকাব্য। মঙ্গলকাব্যও ধর্মীয় কাব্য। তবুও জীবনবাদী মঙ্গলকাব্য রচয়িতাদের কলমে ধর্মীয় সাহিত্যেও মানবজীবনের প্রতিফলন লক্ষণীয়। কবিদের সৃষ্টিতে নারীচরিত্রগুলিও হয়ে উঠেছে জীবনবাদী। ফুল্লরা, লহনা, খুল্লনা, মনসা, সনকা, বেহুলা, মেনকা প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে মানবজীবনের প্রতিফলন দেখি। সামগ্রিকভাবে এরা সবাই পুরুষের নির্যাতনের শিকার যেমন হয়েছে, প্রতিবাদী ভূমিকা গ্রহণেও পিছুপা হয়নি।

নারীবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে মনসার চরিত্রটি অভিনব। পিতৃস্নেহ বঞ্চিত মনসা সৎমা (দুর্গা) আর স্বামীর দ্বারা নিগৃহীত হয়েছে। আক্রান্ত হয়েছে পিতার শিষ্যের দ্বারাও। জীবনের এই প্রেক্ষাপটেই মনসা অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে ঘোষণা করেছে বিদ্রোহ। সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবার জন্য নানারকম কৌশল অবলম্বন করে বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ

ঘটিয়েছে। আর এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে পুরুষতন্ত্রের আধিপত্যের স্বরূপ। মনসার নিগ্রহ থেকে বোঝা যায়, পুরুষতন্ত্র নারীকে যোগ্য মর্যাদা দেয়নি। রক্তমাংসের নারী যেমন নির্যাতন ও নিপীড়নের মধ্যে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে, মনসাও সেইভাবে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। তবে তার প্রতিবাদ প্রতিরোধের নয়, প্রতিআক্রমণের। আর এ কারণেই নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে মনসা বাংলা সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য চরিত্র। কবি ক্ষেমানন্দের কাব্যে ছদ্মবেশিনী মনসার স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়ে নারীর পরাধীনতার কথা সুস্পষ্ট রূপে ব্যক্ত হয়েছে — ''আমি একাকিনী তাহে নারী পরাধীন।'' দেবী হলেও মনসা নারী, তাই তিনি অধিকারহীনা। পুরুষের একচ্ছত্র আধিপত্যের শৃঙ্খল ভেঙে ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় শক্তি প্রয়োগ ছাড়া আর উপায় ছিল না। তবে শেষ পর্যন্ত মনসা তার আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সাফল্য অর্জন করেছেন। আসলে মনসা তৎকালীন অবরুদ্ধ, অবমূল্যায়িত ও অধিকারবঞ্চিত নারীর প্রতিনিধিত্বকারী প্রতীকী চরিত্র।

মনসামঙ্গলের সামন্ত্রতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পুরুষ ছিল সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, সমাজ ও ধর্মের নিয়ন্তা। তাই তারা স্ত্রীর অনুমতি ছাড়াই একাধিক বিয়ে করা কিংবা শুধু ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্য পরনারীর প্রতি আসক্তিকে সমাজ ও ধর্মীয় রীতিসিদ্ধ করে নিয়েছিল। অন্যদিকে পুরুষের অনুমতি বা সহায়তা ছাড়া এককভাবে কোনো ধর্মীয় বা সামাজিক কার্যসম্পাদনও কোনো নারীর পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার ছিল। অর্থাৎ সে সমাজে পুরুষ ছিল সর্ববন্ধনমুক্ত আর নারী পুরুষ প্রবর্তিত রীতি-নীতির শৃঙ্খলে সম্পূর্ণরূপে শৃঙ্খলিত। পুরুষ তাঁর স্ত্রীকে বাদ দিয়ে একাধিক পরনারীর সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে মত্ত হতে পেরেছে। অথচ একজন নারীর সামাজিক মর্যাদা নিরূপণের মাপকাঠি ছিল সতীত্ব। মনসামঙ্গল কাব্যের সমাজসচেতন করিয়া তাঁদের রচনাকর্মে সেকালের সমাজ-জীবনে নারী ও পুরুষের সামাজিক অবস্থান, তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, মানসপ্রবণতা ও দৃষ্টিভঙ্গি সুনিপুণ দক্ষতার সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন।

একথা শুধু মনসামঙ্গল নয় অন্যান্য মঙ্গলকাব্য সম্পর্কেও প্রযোজ্য। 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যেও দেখি পুরুষ অনেক বেশি প্রতিষ্ঠিত আর নারী পুরুষের উপর নির্ভরশীল। এ কাব্যে ব্যাধখন্ড ও বণিকখণ্ড মিলে যে সামগ্রিক কাহিনি গড়ে উঠেছে তাতে তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থাই চিত্রিত হয়েছে। সর্বত্রই নারীর তুলনায় পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশিত।

চন্ডীমঙ্গল কাব্যের উজ্জ্বল চরিত্র ফুল্লরা। সংসারের যাবতীয় কাজ, হাটে হাটে বা ঘরে-ঘরে মাংস বিক্রি, ভোজনরসিক স্বামীর নানাবিধ ব্যঞ্জন প্রস্তুত সমস্তই কাঁধে তুলে নেয়। কিন্তু নারীর এই গৃহকর্মের স্বীকৃতি যেমন একালে মেলে না; তেমনি সেকালেও ছিল না। পক্ষান্তরে দেখা যায় কালকেতু কেবল শিকার করেই তার দায়িত্ব শেষ করেছে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষের আধিপত্য আর নারীর অবমূল্যায়ণের বিষয়টি এখানেও স্পষ্ট। ধনীপুরুষ অর্থবৃত্তের লোভ দেখিয়ে যা খুশি করতে পারতো, বিশেষ করে নারীর প্রতি অবিচার করাও বৈধ বলে গণ্য হতো। ধনপতি এক স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও খুল্লনাকে বিয়ে করার জন্য ছলনার আশ্রয় নেয়। দুর্বলমতি লহনাকে উপঢৌকন দিয়ে কার্যসিদ্ধি করে। ভাঁড়ুদত্তের ঘরেও দুই-স্ত্রী ছিল। সপত্নী কলহের চিত্রও এখানে উপস্থিত। এ কাব্যে খুল্লনা এক নির্যাতিতা নারী। সতীন, স্বামী কোন দিক থেকে না যন্ত্রণা পেয়েছে। এমন কি ঈশ্বর সাধনার অধিকারটুকুও তার ছিল না। পুরুষের নারীবিদ্বেষ এত প্রবল ছিল যে ধনপতি খুল্লনার স্ত্রী-দেবতা চণ্ডীর পূজার বিরোধীতা করেছে। চণ্ডীর ঘটে লাথি মেরে তার পূজার্চনা নষ্ট করে দিতে চেয়েছে। পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে পিতৃতন্ত্রের পোষকতা করেছে নারীরাই। তাই ননদিনী বা শাশুড়িরা অত্যাচারী হয়ে ওঠে। ফুল্লরার অশ্রুসিক্ত নয়ন দেখে কালকেতু প্রশ্ন করেছিল —

''শাশুড়ি ননদী নাহি নাহি তোর সতা।

কার সঙ্গে দ্বন্দ্ব করি চক্ষু কৈলি রতা।।"

অর্থাৎ অত্যাচার শুধু সতীনের ছিল না। শাশুড়ি-ননদেরও ছিল।

আবার দাম্পত্য সম্পর্কে নারীর অসন্তোষ নারীর অ-সুখী গার্হস্থ্য-জীবনকেই তুলে ধরে। এসূত্রেই উল্লেখ করা যেতে পারে মঙ্গলকাব্যের বিভিন্নশাখায় সতীগণের পতিনিন্দার কথা। স্বামীর অনাদর ও উপেক্ষার কারণেই তাদের পতিনিন্দা। চণ্ডীমঙ্গলে লহনা বলছে —

"জীয়ন্ত স্বামীতে যার কিছু নাহি সুখ।
সে জন মরিলে তার কিবা হয় দুখ।।"

আবার মানিক রায়ের ধর্মমঙ্গলে নয়নীর মানসিকতার অভিব্যক্তি — 'রাঁড় হয়ে নয়নীর আনন্দ বাড়িল।' স্বামীর মৃত্যু তাকে যেন বন্ধন থেকে মুক্ত করল আর এই মুক্তিতেই তার আনন্দ। নারীদের উপরোক্ত অভিব্যক্তি প্রমাণ করে সে সময়ের নারীরা পুরষের কাছে যথেষ্ট সম্মানের সঙ্গে গৃহীত হয়নি বলেই তারা পুরুষের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চেয়েছে।

মঙ্গলকাব্যের আর একটি উল্লেখযোগ্য শাখা হল অন্নদামঙ্গল। এই কাব্যের বিদ্যা-সুন্দরের কাহিনীর মধ্যেও যেন পুরুষেরই জয় ঘোষিত হয়েছে। নারী সে বিদ্যা বুদ্ধিতে বা যে কোনো দিক দিয়ে প্রতিভাবতী হলে পুরুষ রচয়িতা তার কলম দিয়ে তার থেকে উন্নত পুরুষ চরিত্র অঙ্কন করেন, সেখানে নীরা অজেয় থাকতে পারেন না। বিদ্যা-সুন্দরের কাহিনীতে ভারতচন্দ্র যেন সে রকমটাই করেছেন। পুরুষ সেখানে নারীর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে পারেনি। সুন্দর বিদ্যাকে শ্রেষ্ঠত্বের দিক থেকে হারিয়ে দিয়ে তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছে।

এই কাব্যে আমরা হীরামালিনীকে দেখি সে মালা বিক্রেতা। অর্থাৎ নারীর অবরোধ-এর বাইরে গিয়ে জীবিকা নির্বাহের পথ উন্মুক্ত ছিল — এই শ্রমজীবি নারীদের জন্য। অন্যদিকে শ্রীনিবাস আচার্যের ত্রিপদী পদে রাধা মনে হয় অবরোধের কথাই বলেছেন —

"অনুক্ষণ কোণে থাকি বসনে আপনা ঢাকি
দুয়ার বাহিরে পরবাস।"

অবশ্য মেয়েরা যেখানে জীবিকা নির্বাহের জন্য কাজ করে সেখানে তো ঘরের বাইরে যেতেই হবে, তাই অবরোধের কথা চলে না। মধ্যযুগেও শ্রমজীবী নারীদের ক্ষেত্রে পুরুষতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ মুক্তি লক্ষ্যণীয়।

ময়মনসিংহ গীতিকা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। এখানে প্রাগাধুনিক সাহিত্যের দেববাদের বিপ্রতীপে মানুষের জয়গান ধ্বনিত হয়েছে। এই গীতিকার বিভিন্ন কাহিনীর নারী চরিত্রগুলি যেমন — লীলা, কাজলরেখা, চন্দ্রাবতী, কমলা, মদিনা নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। ময়মনসিংহ গীতিকার পালাগুলির অধিকাংশই প্রণয়োপখ্যান। এই রোমান্টিক কাহিনীর মধ্যে নারীর যে সংগ্রামী অথচ ব্যর্থ রূপ ফুটে উঠেছে তা বিষাদাত্মক। পুরুষতন্ত্রের কারণে নারী অবদমিত থাকার জন্যই নারী চরিত্রগুলি ত্যাগ ও মহিমার পথে অগ্রসর হয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করেছে। 'মহুয়া' পালায় দেখি প্রেমের জন্য 'মহুয়া যে একনিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছে তা সেকালের সমাজের ছিল অকল্পনীয়। নদের চাঁদের জন্য এমন কোনো ত্যাগ বা কাজ নেই যে মহুয়া করেনি। পুরুষতন্ত্রের সার্বিক পরিবেশের মধ্যেও মহুয়া অনন্য একটি চরিত্র হয়ে উঠেছে। মহুয়াই সম্ভবত বাংলা সাহিত্যের প্রথম নারী যে নিজের ইচ্ছানুসারে প্রেমিক নির্বাচন করেছে, প্রেমিককে স্বামী হিসেবে পেতে চেয়েছে, আর এজন্য আত্মবিসর্জনেও পিছপা হয়নি। পুরুষতান্ত্রিক

সমাজব্যবস্থার বিধিবিধানকে শিরোধার্য বলে মেনে নেয়নি। এ কারণেই দেবেন্দ্রকুমার ঘোষ বলেন, ''ময়মনসিংহ গীতিকার নারী চরিত্রগুলি একনিষ্ঠ প্রেম ও ত্যাগের মহিমায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। সরলা পল্লী বালার স্বাভাবিক প্রণয় শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়বিলাসের মোহ নয়, ইহা প্রিয়তমের প্রেম পূজায় আত্মবিসর্জন।''[৩] মহুয়া ছাড়াও এ ধরনের প্রেমের কারণে আত্মবিসর্জিত হৃদয়গ্রাহী বিষাদাত্মক চরিত্রের প্রতিবিম্বগুলি হলো — মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, লীলা, সোনাই, রূপবতী, সখিনা, দেওয়ানা মদিনা প্রভৃতি।

মধ্যযুগের সমগ্র কাব্যধারার মধ্যে ময়মনসিংহ গীতিকায় বিকশিত প্রেমের ধারাটি স্বাধীন, মুক্ত ও স্বতন্ত্র। সেখানে সমাজ, বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে প্রেম তার নিজস্ব গতিতে অগ্রসর হয়েছে। এই অপ্রতিরোধ্য মানবিক মুক্ত প্রেমের কারণেই গাথা-গীতিকায় নারী চরিত্রের অপরিসীম প্রাধান্য লক্ষণীয়। ক্ষেত্রগুপ্তের মন্তব্যে সে কথাই উচ্চারিত হয়েছে — ''হৃদয়ের অপ্রতিরোধ্য গতিতে কিংবা সচেতন ক্রিয়ায় অনুভূতির সুগভীর তীব্রতায় নারীরাই 'মৈমনসিং গীতিকার' নিয়ন্ত্রণ শক্তি। আর এর চরম গৌরব আত্মত্যাগে।''[৪] বলা বাহুল্য, মৈমনসিং গীতিকায় বিকশিত নারী চরিত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে তৎকালীন সমাজের সামগ্রিক প্রতিবেশের প্রভাবকে স্বীকার করতেই হয়। তৎকালীন নারীর জীবনে যে কষ্ট বা দুর্ভোগ ঘটেছে, তার সবটাই ঘটেছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীকে অবদমিত, বঞ্চিত, অবমানিত করার জন্য এবং অত্যধিক মাত্রায় পুরুষ প্রাধান্যের কারণে।

মধ্যযুগে কালে রচিত চন্দ্রাবতীর রামায়ণ পালায় নারীর ভিন্ন স্বর শুনতে পাই। চন্দ্রাবতীর রামায়ণ বাল্মীকির মূল রামায়ণ বা কৃত্তিবাসের অনুসৃত রামায়ণের অনুকরণে লেখা নয়। নারী মহাকবির কলমে এ এক নবনির্মাণ। এখানে কাহিনী বিন্যাস ও চরিত্রায়নে নারীর প্রাধান্য সুস্পষ্টভাবে লক্ষণীয়। চন্দ্রাবতীর রামায়ণে রামকে প্রান্তিক করে সীতাকে কেন্দ্রে স্থাপন করা হয়েছে। সীতা ছাড়া রামের উপস্থিতি এখানে অনুল্লেখ্য। এর কাহিনীও বর্ণিত হয়েছে সীতার আত্মকথনের আঙ্গিকে। চন্দ্রাবতীর রামায়ণ হল সতীত্বের গল্প। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অন্তঃপুরে নারী যে যন্ত্রণা ভোগ করতো, সেই নিঃসঙ্গতা, একাকীত্বের ছবি সীতার চরিত্রে স্পষ্ট। চন্দ্রাবতীর রামায়ণের কাহিনীর সমাপ্তিও ঘটেছে সীতার আত্মহননের মধ্য দিয়ে। যুগে যুগে নারীর জীবন এভাবেই পরিসমাপ্ত হয়েছে। প্রথাবিরুদ্ধ এই রামায়ণগান পুরুষশাসিত সমাজে গ্রহণযোগ্যতা তো পায়ইনি বরং নিন্দিত হয়েছে। তবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি সমস্ত কিছু পুরষের দ্বারা নির্ধারিত হলেও পূর্ববঙ্গের গ্রামাঞ্চলের মেয়েরা তাদের নিজস্ব উৎসব অনুষ্ঠানে চন্দ্রাবতীর রামায়ণকেই বেছে নিয়েছেন, পৌরাণিক পুরুষ সাহিত্যিকের রামায়ণকে বয়কট করে। এখানেই নারীবাদী কবির ভিন্ন চিন্তনের সার্থকতা।

এতক্ষণ আমরা প্রাগাধুনিক বাংলাসাহিত্যে নারীচেতনার বিভিন্ন মাত্রা প্রতিফলনের সন্ধান করেছি। তবে এখানে আরো একটি বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা প্রয়োজন। সেটি হল পুরুষতন্ত্র নারীর তুলনায় সব বিষয়ে অগ্রাধিকার দিয়েছে পুরুষকে বা পুরুষকে কেন্দ্রে স্থাপন করে নারীকে প্রান্তিক অবস্থানে রেখেছে — প্রাগধুনিক বাংলা সাহিত্যে সবক্ষেত্রে এর পোষকতা পাই না; কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীর গুরুত্বকেও স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। কয়েকটির দৃষ্টান্তের সাহায্যে আমাদের বক্তব্যকে স্পষ্ট করতে পারি। সাধারণত কন্যার জন্মলাভে পিতামাতা হতাশ হন, অসন্তুষ্ট হন। কিন্তু বিপ্রদাস পিপিলাই-এর মনসাবিজয়, মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল, দ্বিজ মাধবের মঙ্গলচণ্ডীর গীত, আলাওলের পদ্মাবতী, মানিকরাম গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল কাব্যে কন্যার জন্মে নিরানন্দের পরিবর্তে আনন্দের প্রকাশ দেখা যায়।

বিপ্রদাসের কাব্যে পাই — সুমিত্রাও সাহে সদাবার — ''কন্যালাগি পূজে হরগৌরী।'' আবার বেহুলার জন্মসময়ে পিতামাতার ''দেখিয়া সানন্দ বাড়ে মনে'', এমনকি ধাত্রী পর্যন্ত ''হরষিত হৈয়া / কন্যারে কোলেতে লইয়া / নাড়িচ্ছেদ কৈল ততক্ষণে।'' মানিকরামের ধর্মমঙ্গলেও দেখি রঞ্জাবতির জন্মে বেনু রায় ও বিমলার ''কন্যা দেখে দোঁহাকার বাড়িল কৌতুক।'' আর আলাওলের পদ্মাবতী রাজকন্যা — তার জন্মোপলক্ষে সাতদিন ধরে আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, শিক্ষার ক্ষেত্রেও কন্যার গুরুত্বের কথাও প্রাগাধুনিক সাহিত্যে উল্লিখিত হয়েছে। পাঁচ বছর বয়সে আলাওলের কাব্যের পদ্মাবতী ছাত্রশালায় গুরুর কাছে পড়তে যায় এবং সাত বছর শিক্ষালাভ করে পাণ্ডিত্য অর্জন করে। ছেলেরাও ওই একই বয়সেই পড়তে শুরু করত এবং ছেলেমেয়ে একত্রেই পাঠশালায় শিক্ষাগ্রহণ করত। চণ্ডীমঙ্গলের লহনা, খুল্লনা ও লীলাবতীর চিঠি লেখা ও পড়ার মত বিদ্যা ছিল। সবচেয়ে বিদুষী ছিলেন বোধহয় ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যের বিদ্যা, কবির ভাষায় তিনি রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী। বিদ্যা শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন ব্যাকরণ, অভিধান, সাহিত্য, নাটক, অলঙ্কার, ষড়দর্শন, পুরাণ, সংহিতা, স্মৃতি এবং আরো অনেক কিছু। সুতরাং প্রাগাধুনিক সাহিত্যে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল। তবে বিদ্যাশিক্ষা যে সীমাবদ্ধ ছিল তাও বোঝা যায়। ব্যাধের সন্তান কালকেতুর বিদ্যাশিক্ষার কোনো উল্লেখ কবিরা করেননি। তবে পৈতৃক বৃত্তি সে ঠিকই আয়ত্ত করেছিল। ব্যাধের কন্যা ফুল্লরারও লেখাপড়ার প্রশ্ন ওঠেনি।

সংক্ষেপে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে প্রতিফলিত নারীচেতনার বিভিন্ন প্রসঙ্গ আলোচিত হল। সামগ্রিকভাবে এই সময়ের সাহিত্য থেকে লেখকদের অভিব্যক্তির সূত্রে তৎকালীন সমাজের নারী-পুরুষের অবস্থানের একটি সম্যক চিত্র পরিস্ফুট হয়; যাকে এ কালের নারীবাদ ও জেন্ডারতত্ত্বের সূতিকাগার বলা যেতে পারে।

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থ :

১। মল্লিকা সেনগুপ্ত, স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯, পৃ - ১৫।

২। সৈয়দা নাজনীন আখতার, সাহিত্যে নারীর জীবন ও পরিসর, সম্পাদনা সেলিনা হোসেন, বিশ্বজিৎ ঘোষ, মাসুদজ্জামান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ - ২৭৩।

৩। শ্রী দেবেন্দ্র কুমার ঘোষ, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৫৯, পৃ - ৩১৪।

৪। ক্ষেত্রগুপ্ত, প্রাচীনকাব্য : সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন, কলিকাতা, পৃ - ১৫৪।

সতীদাহ ঃ প্রথা ও সমাজ

সুশেন্দু বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ

'নারী' শব্দটি কি গভীর তাৎপর্যময়, এই শব্দটি শ্রবণমাত্রই প্রথমেই যার কথা মনে পড়ে তিনি হলেন প্রত্যেক মানুষের পরম প্রিয় মাতৃদেবী। অথচ এই শ্রেণীকে সভ্যতার কি নিষ্ঠুর নিয়মের যাতাকলে পেষাই করা হয়েছে প্রাগার্য যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত। সেই নিষ্ঠুর, অবৈজ্ঞানিক, পক্ষপাতদুষ্ট প্রথা বা নিয়মটি হল 'সহমরণ' বা 'সতী' প্রথা। 'সতী' প্রথার ইতিহাস সন্ধান করতে গিয়ে বুঝা যায় এই প্রথার শিকড় বহু দূরে বিস্তৃত এবং এই সতীপ্রথা ধীরে ধীরে ভারতীয় সমাজ সভ্যতার সঙ্গে কী নিষ্ঠুরভাবে সম্পৃক্ত হয়ে নারী ধ্বংসের রীতিতে পরিণত হয়েছে।

সুপ্রাচীন কাল থেকে সহমরণ প্রথা মিশর থেকে ভারত পর্যন্ত অনেক দেশে প্রচলিত ছিল। যদিও সেই 'সহমরণ' 'সতীদাহ' বলতে আমরা যা বুঝি, ঠিক তা নয়। এই 'সহমরণ' অনুসারে রাজা, মহারাজা এবং অন্যান্য বিশিষ্ট লোকের মৃত্যু হলে জন্মান্তরে বিশ্বাসী পরিজনদের ভাবনা হত যে এরা পরলোকে গিয়ে প্রিয় মন্ত্রী, সহচর, পরিচালক প্রভৃতির অভাবে কষ্টবোধ করবেন, তাই ঘনিষ্ট ব্যক্তিরা স্বেচ্ছায় সহমরণ বরণ করে নিত। অবশ্য এই ঘনিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে স্ত্রী ছিল অন্যতম্য কিন্তু এই মৃত্যুর সঙ্গে ধর্মবিশ্বাসের কোন যোগ নেই। (১) এটা সত্য যে এই রীতির সঙ্গে ধর্মবিশ্বাসের কোন যোগ নেই কিন্তু এই রীতি বদলে কীভাবে 'সতীদাহ' প্রথায় বিবর্তিত হল সেই ইতিহাস জানা যায় না। তবে সতীত্ব রক্ষার সঙ্গে এই প্রথার যোগ ছিল বলে মনে হয়।

বৈদিক যুগ থেকেই নারী শ্রেণীকে সহমরণের পথে নিয়ে যেতে বিভিন্ন উপায়ে প্রচেষ্টা করবার অনেক নিদর্শন রয়েছে। বৈদিক যুগে স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা স্ত্রীরা প্রতীকী আত্মোৎসর্গের অনুষ্ঠান করত। এই অনুষ্ঠান কেবল অভিজাতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল কিনা, তা জানা যায় না। পরের যুগে অর্থাৎ পরবর্তী বৈদিক যুগে স্বামীর চিতায় বিধবাদের আত্মোৎসর্গের প্রথা এসেছিল সম্ভবত এই অনুষ্ঠানের সূত্র ধরেই। বৈদিক যুগে সতীপ্রথা যে নিতান্তই প্রতীকী ছিল তার প্রমাণ হল বৈদিক সাহিত্যে বিধবাদের পুনর্বিবাহের উল্লেখ। (২) এই প্রতীকী 'সহমরণ' প্রথাই ক্রমেই কালের অমোঘ গতিতে ক্রমশ নিষ্ঠুর 'সহমরণ' প্রথায় পরিণত হয়েছে, তার নিদর্শন ভারতীয় ইতিহাসে সুস্পষ্ট।

অথর্ব বেদে আমরা দেখি মৃতের বধূ হবার জন্য জীবিত নারীকে নীত হতে দেখা যায়। তাহলে প্রশ্ন জাগে যে এই প্রথা কত প্রাচীন? এটি কি প্রাগার্য যুগের? গ্রীক, রোমান, জার্মান অথবা প্রাচীন কেল্টিক সাহিত্যে অর্থাৎ অন্যান্য সমগোত্রীয় ইন্দো-ইউরোপীয় সাহিত্যে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীকে দাহ করার কোন সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। যেখানে অথবা যখনই এর সূচনা হোক, প্রমাণ রয়েছে যে আর্য ও প্রাগার্যদের মিশ্র জনগোষ্ঠী অন্তত আংশিকভাবে, সাময়িকভাবে হলেও অথবা আঞ্চলিকভাবে এই প্রথাকে গ্রহণ করেছিল যদিও কখনই প্রথাটি বহুল প্রচলিত হতে পারেনি। (৩) নারীকে পরবর্তী বৈদিক যুগ থেকে অত্যন্ত অবজ্ঞার চোখে দেখা করা হতে থাকে। রোমে যেমন নারী ও দাসের সঙ্গে সমান ব্যবহার করা হোত সেরকম ভারতেও বর্ণবিভাজিত পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারী ও শুদ্র

ছিল একই শ্রেণীভুক্ত। মূল সংস্কৃত শাস্ত্রের অনেক অনুচ্ছেদে নারী ও শুদ্রের সঙ্গে সমান ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। বৈদিকোত্তর যুগে উভয়ের বেদপাঠ ও বৈদিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের অধিকার ছিল না। নারী ও শুদ্রকে সমদৃষ্টিতে দেখার প্রথম উল্লেখ খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের গ্রন্থ 'শতপথ ব্রাহ্মণ' এ পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাকগুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগের বেশিরভাগ গ্রন্থে নারীকে সেবকশ্রেণী শুদ্রের সঙ্গে সমপর্যায়ভুক্ত ও পরাধীন করে রাখার প্রমাণ পাওয়া যায়। এইভাবে প্রাকসামন্ততান্ত্রিক ও সামন্ততান্ত্রিক উভয় পর্বেই সাধারণভাবে নারীর পরাধীনতা বিশেষ করে উচ্চতর বর্ণের মধ্যে একটি বাস্তব সত্য ও মতাদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। (৪) নারী শ্রেণীকে এইভাবে ক্রমান্বয়ে হীন নীচ ভাবে প্রতিষ্ঠা করবার প্রয়াস আমরা ভারতীয় ইতিহাসে দেখতে পাই।

পরবর্তী বৈদিক যুগে নারী তার আপন ভাগ্য জয় করবার অধিকার আরো বেশি করে হারিয়েছিল। ব্রাহ্মণ সাহিত্যে এবং সংহিতা সমূহে তার চিহ্ন অতিশয় স্পষ্ট। সেখানে কন্যার জন্মের জন্য শোক প্রকাশ এবং পুত্রের জন্য প্রার্থনা প্রকাশিত করা হয়েছে। একথা সত্য যে, শিক্ষায় ও চিন্তায় এ যুগের কোনো কোনো নারী যেমন গার্গী ও মৈত্রেয়ী চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিলেন। দার্শনিক তত্ত্বালোচনায় অংশগ্রহণ করে তাঁরা ঋক-বৈদিক যুগের ঘোষা, অপালা প্রভৃতির ঐতিহ্যকে রক্ষা করেছিলেন, তাও মিথ্যা নয়। ধর্মাচরণে সে যুগের নারীদের পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকারও স্বীকৃত সত্য। কিন্তু এই সব তথ্য প্রকৃত চিত্রকে খানিক অস্পষ্ট করলেও পুরোপুরি আড়াল করতে পারে না। তৎকালীন সমাজে নারীর অবমূল্যায়ন করেছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আদিমযুগে নারীর ওপর পুরুষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা ও তাঁকে অস্থাবর সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই ধারণা থেকেই 'সতীপ্রথা'র উদ্ভব হয় ও প্রসার ঘটে। হেরোডোটাসের লেখায়, খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে মধ্য এশিয়ার সিথিয়ানদের মধ্যে বিধবাদের দাহ করার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কিন্তু পরবর্তীকালে সেখানে এই প্রথার প্রচলন দেখা যায় না। সেই রকম প্রাচীন মিশরে মাতৃবংশীয় পরম্পরা চালু থাকলেও সেখানে রাজা অর্থাৎ ফারাওদের পরলোকযাত্রায় সঙ্গ দেওয়ার জন্য তাদের স্ত্রীদেরও কবর দেওয়া হত। তবে মিশরে রাজ পরিবারের বাইরে বিধবা দাহের ব্যাপক প্রচলনের কোনো প্রমাণ নেই। ভারতেই শুধু 'সতী' একটি নিয়মিত 'প্রথা' হিসাবে, বিশেষ করে রাজপুতদের মধ্যে বিকাশ লাভ করে। 'সতী'র সবচেয়ে পুরনো লৈখিক উল্লেখ খ্রীষ্টিয় ষষ্ঠ শতকের গোড়ার, পূর্বের নয়। পরবর্তীকালের লেখা থেকে অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মধ্যপ্রদেশের পশ্চিমভাগ ও রাজস্থানে 'সতী স্মারক শিলা' আবিষ্কৃত হয়েছে। ভারতে বিশেষ করে প্রাচীন রাজপুত রাজ্যগুলিতে, 'সতী স্মারক শিলা' পাওয়া যায়। এর মধ্যে কিছু মধ্যপ্রদেশের চন্দেল্ল ও কলচুরি রাজ্যে দেখা যায় কিন্তু এদের অধিকাংশই পাওয়া যায় রাজস্থানে। রাজস্থানে 'সতী শিলা লিপি' প্রথা বিংশ শতক পর্যন্ত দেখতে পাওয়া গিয়েছে। ইতালীর ভারতত্ত্ববিদ এল. পি. টেমসিটারী বর্তমান শতকের দ্বিতীয় দশকে পূর্বতন বিকানীর ও জয়পুরে কর্মরত ছিলেন। তিনি বহুসংখ্যক 'সতী শিলালিপি' উল্লেখ ও সংকলন করেছিলেন। বিহারে উচ্চতর বর্ণ অধ্যুষিত গ্রামে 'সতীস্থান' নিঃসন্দেহে চোখে পড়ে। 'সতীস্থান গুলির সঙ্গে বিধবাদাহ সংক্রান্ত অনেক গল্পগাথা যুক্ত থাকে। এই পবিত্র স্থানগুলির মধ্যে কিছু হল এমন, বাস্তবে সেখানে সামাজিক চাপ অথবা পতির প্রতি চিরন্তন ও একান্ত নিষ্ঠার কারণে বিধবাগণ আত্মাহূতি দেয়। কারণ যাইহোক, 'সতীপ্রথা' বেশিরভাগই রাজপুতদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, যদিও ব্রাহ্মণদের মধ্যেও 'সতী'র দৃষ্টান্তের অভাব নেই। বিশেষ করে রাজপুত পরিবারগুলির মধ্যে ও রাজস্থানে 'সতী প্রথা'র প্রচলন কেন ছিল তার অনুসন্ধান প্রয়োজন।

(৫) ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণগুলির চিন্তাধারায় 'সতীদাহ'কে পবিত্র কর্ম বলা হয়। 'ব্যাসস্মৃতি'র নিদান অনুসারে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ নারীর (অন্য কোন বর্ণের নয়) অধিকার আছে নিজের স্বামীর চিতায় দগ্ধ হবার। এবং যদি সে জীবিত থাকে, তবে উত্তম বস্ত্র ও গহনা পরিত্যাগ করবে এবং তপস্যার দ্বারা শরীরকে শুদ্ধ করবে। এখানে একটি বিকল্প রয়েছে; বিধবা নারী তপস্বিনী হয়ে বেঁচে থাকতে পারতেন; পরাশরের 'ধর্মসূত্রে'ও বিকল্প ব্যবস্থার স্বীকৃতি রয়েছে; যে নারী স্বামীর মৃত্যুর পর তপস্যাচরণ করে থাকেন তিনি তপস্বীদের মতই স্বর্গলাভ করেন। কিন্তু তার একটু পরেই বলা হয়েছে মানুষের শরীরে সাড়ে তিন কোটি লোম থাকে, যে নারী মৃত্যুতেও তাঁর স্বামীকে অনুগমন করে, সে স্বামীর সঙ্গে তত বৎসরই স্বর্গবাস করে। এখানে অন্তর্নিহিত বক্তব্য এই যে জীবিত থাকার বিকল্প নিকৃষ্ট নারীর জন্যই প্রযোজ্য; সতী নারী সহমরণের পথ বেছে নেয় এবং স্বর্গে চিরকাল স্বামীসঙ্গ লাভ করেন। সদ্য বিধবাকে তার দুর্বল, বিহ্বলতার মুহূর্তে এই কথা বলা হত। 'দক্ষসংহিতা'তে বলা হয়েছে যে সতী নারী স্বামীর মৃত্যুর পর অগ্নিতে প্রবেশ করে সে স্বর্গে পূজা পায়। যে নারী স্বামীর চিতায় আত্মোৎসর্গ করে সে তার পিতৃকুল, স্বামীকুল উভয়কেই পবিত্র করে। 'হারীত সংহিতা'য় বলা হয়েছে এইভাবে 'সহমৃতা' নারী তার মাতৃকূল, পিতৃকুল ও স্বামীকুলকে পবিত্র করে। যজ্ঞবল্ক অবশ্য সহমরণকে অনুমোদন করেন না, সেখানে বলা হয়েছে স্বামীহারা পত্নীর দায়িত্ব নেবেন তাঁর পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, এমনকি মাতুল ভাইরা। অন্যথায় তার নামে নিন্দা হবে। 'বিষ্ণুধর্মসূত্র'র লেখক বলেন বিধবা নারী আজীবন কঠোর সংযম অভ্যাস করবেন। যদিও তিনি তাঁর স্বামীর চিতায় মৃত্যুও সমর্থন করেন। 'মহাভারত'-এর অর্বাচীন সংযোজিত অংশ 'মৌশল পর্ব'তে কৃষ্ণের চার স্ত্রী রুক্মিণী, রোহিণী, ভদ্রা ও মদিরা তাঁর চিতায় সহমৃতা হয়েছিলেন। এমনকি বাসুদেবের আট পত্নীও তাঁর মৃত্যুর পর সহমরণে গিয়েছিলেন। সাধারণত সকল শাস্ত্রকারই আত্মহত্যাকে হীন অপরাধ বলেছেন কিন্তু 'মিতাক্ষরা' ও 'অপরাক' ভাষ্যে বলা হয়েছে 'সতী'র ক্ষেত্রে অর্থাৎ 'সহমরণ'-এর ক্ষেত্রে আত্মহত্যা কোন অপরাধ নয়। অপরাক, অপস্তম্বকে উদ্ধৃত করে বলেছেন, যে নারী মায়াবশে ভ্রান্ত হয়ে চিতা থেকে নেমে আসে সে 'প্রজাপত্য' প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে নিজেকে শুদ্ধ করতে পারে। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, সমস্ত পৃথিবীতেই আত্মহত্যা নিজের প্রতি একটি হিংসাত্মক অপরাধ বলে গণ্য হয়। যদিও সব যুগেই এই সত্য পুরুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, নারীর ক্ষেত্রে কিন্তু 'সতী'র মতো আত্মহত্যার ঘটনা কোন পাপ বা অপরাধ তো নয়-ই, বরং তা পুণ্যকর্ম।

রঘুনন্দন, স্মৃতিশাস্ত্রের নব্য মধ্যযুগীয় পণ্ডিত, অঙ্গীরসকে উদ্ধৃত করে বলেন ''সেই নারী যে চিতারোহণ করে''। রঘুনন্দন অনুমোদন করেন যে বিধবার পক্ষে শ্রেষ্ঠপন্থা হলো মৃত স্বামীর চিতায় আরোহণ করা, কিন্তু তিনিও, যারা স্বামীর মৃত্যুর পরে বেঁচে থাকতেই চায় তাদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা রেখেছেন। তাঁর মতে, যে 'সতী' হয় সে হল শ্রেষ্ঠ, কিন্তু অন্যরাও থাকতে পারে, যারা শ্রেষ্ঠ নাহলেও বাঁচতে চায়, সে জন্য তাদের পাপী মনে করা উচিৎ নয়। 'ব্রহ্মপুরাণ' বলে যদি স্বামীর প্রবাসে মৃত্যু হয়ে থাকে তবে স্ত্রীর কর্তব্য স্বামীর পাদুকা বুকে ধরে অগ্নিপ্রবেশ করা। ব্যাসধর্মশাস্ত্র বলে যদি স্বামী এমন দূরত্বে মারা যায়, যে পথ এক দিনের, তবে যতক্ষণ না স্ত্রী সহমরণের জন্য উপস্থিত হচ্ছে ততক্ষণ দাহ করা উচিৎ নয়। বিভিন্ন শাস্ত্র গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য সংক্ষেপে এই কথাই বলে : হয় তাকে স্বামীর সঙ্গে দাহ কর নতুবা তার জীবৎকালকে করে তোল জীবস্মৃত।

মানবিক মর্যাদার পক্ষে যা কিছু অতি গুরুত্বপূর্ণ আমাদের সমাজ তার সবকিছু থেকেই নারীকে বঞ্চিত করেছে : সুদূর বৈদিক যুগেই সে তার শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত, জীবনের জন্য তার পাথেয় হল দৈহিক সৌন্দর্য,

যৌবন, সন্তান ধারণের যোগ্যতা। শূদ্রের মতোই সেও কেবল প্রভুর সম্পত্তি। এই পরিস্থিতিতে, শাস্ত্র নারীর জন্য একটিই ভূমিকার নির্দেশ দিয়েছে — পতিব্রতার ভূমিকা। কেবল এই কাজটিতে সফল হলেই একজন নারী জনগণের মনযোগ পেতে পারে। সার্থকতার উপায় হল স্বামী ও শ্বশুর কুলের সেবায় তাদের প্রসন্নতার জন্য নিঃশব্দ আত্মসমর্পণ। যদি সে প্রদীপের আলোয় আরো বেশি করে আসতে চায় তবে সেইভাবে গুরুত্ব পাবার উপায় হল 'সতী' হওয়া, পতিব্রতার জীবনের চূড়ান্ত পর্যায়। সমস্ত পুরাণগুলি এবং পরবর্তী সাহিত্যের অধিকাংশই 'সতী'র প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

নারী নির্যাতনের অন্যান্য উপাদানের মতই এই সতীদাহের মূলও তারই অবচেতনার গভীরে প্রোথিত। এবং কুসংস্কারে লালিত অজ্ঞানে আচ্ছন্ন এই নারীর জন্য সমাজ কোন পালানোর রাস্তা খুলে রাখেনি। মাঝে মাঝে যদি দু-এক জন নারী সহমরণে না যান তবে তো 'সতীত্বের' গৌরবময় স্মৃতি জনচেতনায় মলিন হয়ে যাবে। এবং যদি মাঝে মাঝে সতীর স্মৃতিতে মন্দির, প্রার্থনাকক্ষ গড়া হয় তবে তো পুরোহিতদেরই ভবিষ্যৎ নিশ্চিত হয়। আর যুগ যুগ ধরে যে অতিকথা সোচ্চারে ঘোষিত হয়ে আসছে যে কেবলমাত্র কোন হিন্দু নারী তাঁর স্বামীর জন্য জীবন দিতে পারে (অন্যান্য ধর্ম ও সংস্কৃতিতে অনুরূপ উদাহরণগুলি অগ্রাহ্য করে এবং এই সব নারীদের 'সতী' আখ্যাও দেওয়া হয় না।) সেই দাবিও যুগে যুগে প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং মাঝে মাঝে কোন অভাগিনীকে পুড়িয়ে মেরে যদি 'সতীত্বে'র গৌরব শিখা অম্লান থাকে তবে সমাজের, বিশেষ করে পুরোহিত ও নীতিবাগীশদের স্বার্থ রক্ষিত হয়। 'বৃহৎসংহিতা'র যুগ থেকেই সমাজ এই অতিকথা ঘোষণা করে আসছে যে নারী তাঁর স্বামীর প্রতি ভালবাসার জন্যই সহমরণে যায়। এই মিথ্যার অবসান হওয়া উচিৎ। যদি স্বামীর প্রতি প্রেমে এক নারী আত্মহত্যা করে তবে কেন আজ পর্যন্ত কোন স্বামী তাঁর স্ত্রীর চিতায় আত্মহত্যা করে নি? এ তো হতে পারে না যে আজ পর্যন্ত কোন স্বামী তার স্ত্রীকে ভালোবাসেনি। যদি সতীদাহের ভিত্তি হতো প্রেম, তবে আমরা অবশ্যই কিছু কিছু ঘটনা দেখতে পেতাম যেখানে মৃত স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীও সহমরণে গিয়েছেন।

(৬) এইভাবে 'সতীপ্রথা'র নামে নারকীয়, নৃশংস হত্যালীলা চলেছে ভারতীয় সমাজে সুদীর্ঘকাল ধরে। অবশেষে রাজা রামমোহন রায়ের উদ্যোগে ও সক্রিয় প্রতিবাদে এই অমানবিক নিষ্ঠুর প্রথাকে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক নিষিদ্ধ করেন ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে সরকারি আইন করে। তবে সরকারি আইনের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে ওঠে কিন্তু বেন্টিক তার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। সরকারী বিধিনিষেধ জারি হওয়ার ফলে সতীদাহের ঘটনা আস্তে আস্তে কমতে থাকে।

(৭) সরকারী বিধিনিষেধ এবং রাজা রামমোহন রায়ের আন্দোলনের ফলেও সতীপ্রথা আরো ১০০ বছরেরও বেশি কাল ব্যাপি ভারতীয় সমাজে কঠোরভাবে বলবৎ থাকে। সতীদাহ বিরোধী আন্দোলনের প্রাণপুরুষ রামমোহন রায় বুঝেছিলেন যে নারীই ভারতবর্ষে মধ্যযুগীয় অজ্ঞতা ও কুপণ্ডুকতার প্রতীক এবং পুরুষের শক্তি ও স্বার্থের হাত থেকে তাকে মুক্তি দিতে পারলেই নতুন যুগের প্রতিষ্ঠা হবে যথার্থ। ধর্মীয় স্তরে তত্ত্বগতভাবে মানুষ যে মহিলার অধিকারী তাকে সামাজিক স্তরে বস্তুগতভাবে আয়ত্ত করতে হলে প্রথমেই চায় নারীর স্বাতন্ত্র্যের ও স্বাধীনতার স্বীকৃতি এবং তাতেই মানুষের আত্মমহিমার প্রথম উপলব্ধি।

(৮) এই উপলব্ধি থেকেই রামমোহন রায় সতীপ্রথার বিরুদ্ধে নারীমুক্তি আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন এবং সতীপ্রথা ব্রিটিশ সরকার আইন করে নিষিদ্ধ করেন।

সরকারিভাবে সতীপ্রথা নিষিদ্ধ হলেও ভারতবর্ষের প্রত্যন্ত অঞ্চলে চোরাগোপ্তাভাবে এই নারী হত্যা চলতেই থাকে। গত একদশক পূর্বেও ভারতের সংবাদপত্রের পাতায় সতীদাহের সংবাদ খুব বেশি বিরল ছিল না।

তথ্যসূত্র :

১। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গ-প্রসঙ্গ', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত আনন্দ সংস্করণ, এপ্রিল ২০০১, পৃষ্ঠা - ১৫৪।

২। রোমিলা থাপার, 'ভারতবর্ষের ইতিহাস', ওরিয়েন্ট লংম্যান, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০০০, পৃষ্ঠা - ২৩।

৩। সুকুমারী ভট্টাচার্য্য, 'প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ', ভাষান্তর : বিজয়া গোস্বামী, নীলাঞ্জনা শিকদার দত্ত, করুণাসিন্ধু দাস, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা - ১৩৬।

ঔরাঙ্গজেব-দুহিতা জেবউন্নিসা

দোলনচাঁপা ঘোষ
অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ, জঙ্গিপুর কলেজ

মোঘল সম্রাট ঔরাঙ্গজেব ও সাম্রাজ্ঞী দিলরুস বেগমের কন্যা জেবউন্নিসা। শৈশবে ঔরাঙ্গজেব মেয়েকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন অন্য ভাবে। মেয়েদের পড়াশুনা বন্ধ, দরবার থেকে কবি, গায়কদের তাড়িয়ে দেওয়া - এসব ঔরাঙ্গজেবি শাসন-কায়দা জেব উন্নিসার বেলায় ছিল শিথিল। সম্রাট মেয়ের জন্য হাফিজা মরিয়মকে গৃহশিক্ষিকা নিযুক্ত করেন। হাফিজার কাছে পড়তে পড়তে বছর চারেকের মধ্যেই আরবি আয়ত্ত করে ফেলে শিশু জেবউন্নিসা। মাত্র সাত বছর বয়সে পুরো কোরান কণ্ঠস্থ করে 'হাফিজ' হয়ে গেল সে। মেয়ের সাফল্যে তখন রীতিমতো গর্বিত সম্রাট। প্রাণের জেব এর সম্মানে দিল্লীর ময়দানে সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজ করালেন। রাজকোষ থেকে প্রায় ৩০ হাজার স্বর্ণমুদ্রা বিলিয়ে দিলেন গরিব প্রজাদের মধ্যে। উৎসব পালন করতে দুদিনের সরকারি ছুটি ঘোষণা করে দিলেন।

মেয়ের সঙ্গে আরবি, ফার্সিতে, নিয়মিত ধর্মতত্ত্ব নিয়ে চিঠি চালাচালিও হতে লাগলো ঔরাঙ্গজেবের। অথচ এই ঔরাঙ্গজেবই কিনা অন্দরমহলে ধর্ম নিয়ে কথাবার্তাও এক প্রকার নিষিদ্ধই করে দিয়েছিলেন প্রায়। শুধু শিক্ষায় অবশ্য মন ভরত না কন্যের শুরু করলেন কবিতা চর্চা। নিজের মহলে মুশায়েরা বসালেন। কবির লড়াই হল। সে লড়াইয়ে এসেছিলেন নাসের আলি বেহরাজ, ওয়ালিউল্লাহের মত সেই সময়ের বিখ্যাত সব কবি। কবিতা লিখে নাম কুড়াতে লাগলেন রাজকন্যা নিজেও। গৃহশিক্ষিকা হাফিজা তাঁর ছাত্রীর কবিতার মধ্যে খুঁজে পেলেন 'গোটা ভারতবর্ষ'। তাঁর কবিতায় উৎসাহ জোগালেন আরেক মাষ্টার-মশাই শাহু রুস্তম গাজিও। এমনকি কবিতা প্রেমী মেয়েকে উৎসাহ দিতে লাগলেন সম্রাটও। পারস্য, কাশ্মীরের শ্রেষ্ঠ কবিদের ডাক পাঠালেন দরবারে। সবই মেয়ের জন্য। এমনিতে ঔরাঙ্গজেব ছিলেন কবিতা-গানের ঘোরতর বিরোধী। এত কিছুর পরেও বড় হয়ে কিন্তু বাবার সঙ্গে যেন ঠিক হৃদ্যতা জমল না মেয়ের। দরবারি মহলে জেবউন্নিসা বারবার ছুটে যেতেন তাঁর জ্যাঠামশাই দারা শিকোর কাছে। দারা কাব্য দর্শনে সুপন্ডিত। ভাইঝির বেশ কিছু গজল তিনি নিলেন সংকলিত লেখার গ্রন্থ 'দিওয়ান-এ দারা শিকো'য়। জেঠু-ভাইঝির এই সম্পর্ক ভাল চোখে দেখতেন না ঔরাঙ্গজেব। সময় যতই গড়াতে লাগল, বাবা মেয়ে যেন একে অন্যের থেকে কেবলই দূরে সরে যেতে লাগলেন।

একবারের ঘটনা যেমন বাগানে পায়চারি করছেন জেবউন্নিসা, হঠাৎ বান্ধবীদের বললেন, 'জীবনে সুখী হওয়ার জন্য সুরা, ফুল, নদীর স্রোত আর অনাহুত প্রেমিকের মুখে থাকা খুব দরকার'। কথার মাঝে আচমকা পিতার আগমন, এবার বাবার মন রাখতে জেবউন্নিসা বলে ওঠেন, 'জীবনে সুখী হতে দরকার প্রার্থনা, উপবাস, কান্না ও অনুতাপ'। এওতো এক রকম আড়াল-আবডাল ছিল তাতে। দিনে দিনে তাও খসে গেল। শুরু হল সরাসরি সংঘাত। দাদু শাহজাহানের ইচ্ছায়, জেবউন্নিসার সঙ্গে দারা শিকোর ছেলে সুলেমান শেখের বাগদান হয়ে গেল। বিয়েটা কিন্তু হল না। শোনা যায় তাতে ঔরাঙ্গজেবের হাত ছিল। সুলেমানকে হারালেন জেব। তবু প্রেম তাঁর হারায়নি। জেবউন্নিসার অন্য সব প্রার্থীর মধ্যে মির্জা ফারুক ছিলেন একেবারে প্রথম সারিতে। তিনি

পারস্যের শাহ আব্বাসের পুত্র। জেবউন্নিসার ডাকে ফারুক দিল্লী চলে এলেন। দিল্লীর একটি বাগান বাড়িতে দেখা হল দুজনের। ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে ফারুক যখন জেবউন্নসাকে চুম্বন করতে যাবেন, থামলেন রাজকন্যা। প্রত্যাখ্যান। আচম্বিতে প্রেমিকার এমন ব্যবহার ফারুককে স্তম্ভিত করেছিল। পাথরের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে গেলেন তিনি। দিল্লী ছাড়লেন না। নগরের এক আবাস থেকেই 'প্রেমিকা' জেবউন্নিসাকে চিঠি লিখলেন ফারুক, 'এই প্রেমের মন্দির ত্যাগ করতে পারব না। একাকীত্বের আনন্দ উপভোগ করে যাব শুধু'। প্রত্যুত্তরে জেবউন্নিসা মির্জাকে ঠাট্টা করলেন 'শিশু' বলে। লিখলেন, 'বিচ্ছেদের আগুনই আসল ভালবাসা'। 'প্রেমিক'কে এত রূঢ় প্রত্যাখ্যান কেন করেছিলেন তিনি কেউ তা জা নে না আজও। হয়তো এই জন্যই ইতিহাস তাঁকে বারবার চিনে এসেছে রহস্যময়ী হিসেবেই। ভাঙা মন নিয়ে ফারুক ফিরে গেলেন নিজের দেশে, খসে গেলেন তিনি জেবের জীবন থেকে।

প্রেমে পড়েছেন বারবার, কিন্তু জীবনসঙ্গী বেছে নিতে জেবউন্নিসা বরাবরের খেয়ালি। একদিকে জীবনচর্চায় তাঁর ছিল উদার হাওয়া, অন্যদিকে পর্দার ওপারে মুঘল নারীর আড়ালটুকু ছিল তাঁর পছন্দ। জীবন আর ভাবনার এই বৈপরীত্যর যোগফল যেন জেবউন্নিসা।

ছদ্মনাম নিলেন 'মাকফি', আড়াল।

জেবউন্নিসার প্রিয়তম কবি ছিলেন সিরহিন্দের নাসের আলি, ওঁর আড়ালপ্রিয়তা নিয়ে একবার তিনি বলে ফেলেন, ''পর্দা ওঠাও জেব, যদি উপভোগ করতে চাও সৌন্দর্য্য''।

প্রত্যুত্তরে জেবউন্নিসা আড়াল থেকেই শুধু লিখেছিলেন ''আমার কবিতাই আমার পরিচয়''।

অবশেষে কবিতা দিয়েই রহস্যময়ী জেবউন্নিসাকে জিতে নিতে এলেন লাহোরের এক প্রাদেশিক শাসনকর্তার পুত্র আকিল খান। তাঁর পরিণতি আরও নির্মম। সৌন্দর্য্য, বীরত্বের জন্য প্রসিদ্ধ আকিল ছিলেন কবিতার ও বড় সমঝদার। জেবউন্নিসার কবিতার সঙ্গে আগেই পরিচয় ছিল তাঁর। কিন্তু তাঁর প্রেম নিবেদন, জেবকে তাঁর জীবনে পাওয়া আর না-পাওয়াও যেন এক অশ্রুতপূর্ব কাহিনি।

অসুস্থ ঔরাঙ্গজেব তখন হাওয়া বদলের জন্য সপরিবারে লাহোরে। খবর পেয়ে আকিল নগর রক্ষী সেজে রাজ কন্যার প্রাসাদের চারপাশে ইতিউতি ঘোরাঘুরি শুরু করলেন। আচমকা একদিন ভোরে প্রাসাদের ছাদে দেখাও মিলল জেবউন্নিসার। প্রথম আবির্ভাবেই জেবউন্নিসাকে গালনারের সঙ্গে তুলনা করলেন আকিল। গালনার, আফগানি ফুল। রাজকন্যা অবশ্য আকিলকে বিশেষ পাত্তা দিলেন না। উল্টে একটু কঠিনই শোনাল তাঁর উত্তর ''মিনতি, স্তব, সম্পদ অথবা ক্ষমতা দিয়ে আমাকে জেতা সম্ভব নয়।''

হাল ছাড়লেন না আকিল। একদিন তাঁর কাছে খবর এল জেবউন্নিসা বান্ধবীদের সঙ্গে একটি নির্মীয়মান বাগান বাড়ীতে গিয়েছেন। আকিল মাথায় চুন সুরকির ঝুড়ি নিয়ে মজুরের ছদ্মবেশ ধরে মূল ফটক পার করার অনুমতিও জোগাড় করলেন। আকিল দেখলেন বাগানবাড়ির বরান্দায় বান্ধবীদের সঙ্গে 'চৌসার' (পাশা) খেলায় ব্যস্ত জেব। মজুরের বেশধারী আকিল উদগ্রীব হয়ে প্রেম নিবেদন করে বসলেন জেবকে। ''তোমার সঙ্গ পেতে ধুলোর মতো সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছি''। ছদ্মবেশীকে জেব চিনতে পেরে দ্রুত বলে উঠলেন, ধুলো বা বাতাস আমার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না। এরপরে কী করে যেন দ্রুত জেবউন্নিসার বীতরাগ বদলে গেল অনুরাগে।

মেয়ের এই ঘনিষ্ঠতার খবর ঔরঙ্গজেবের কানে পৌঁছল হাওয়ার গতিতে। এবার যেন আর আপত্তি নয়। মেয়ের পছন্দকেই স্বীকৃতি দিলেন সম্রাট।

জেবউন্নিসা আকিলকে দিল্লী আসতে বললেন। কিন্তু তার মধ্যেই এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি আকিলকে খবর দিলেন, দিল্লীতে তাঁর জন্য মৃত্যু ফাঁদ অপেক্ষা করছে। শুনে প্রচন্ড ভয় পেলেন আকিল। জেবউন্নিসাকে জানিয়ে দিলেন, এ বিয়ে করতে তিনি অপারগ। তার পরেও না জানি কেন, আকিল লুকিয়ে দিল্লী চলে এলেন। ফের দেখা হল দুজনের। বাগানবাড়িতে গল্পে মসগুল জেব-আকিল। আচমকা ঔরাঙ্গজেবের আসার খবর পাওয়া গেল। হঠাৎ কোনো এক আশঙ্কায় জেবউন্নিসার মনে 'কু' ডাকল, সামনেই ছিল জল রাখার ডেকচি। সেটি দেখিয়ে আকিলকে তক্ষুনি তার ভিতরেই লুকিয়ে পড়তে বললেন। এদিকে গোপন সুত্রে আকিল আসার খবর পেয়েছেন ঔরাঙ্গজেব। মেয়েকে দেখেই বললেন 'কি আছে ডেকচিতে?" ভীত সন্ত্রস্ত জেব কোনও ক্রমে উত্তর দিলেন, 'গরম করার জল'। ঔরাঙ্গজেব হুকুম দিলেন ওটি উনুনে চাপিয়ে দেওয়া হোক। কথিত আছে জেবউন্নিসা তখন ডেকচির কাছে গিয়ে অত্যন্ত ধীর স্বরে বলেছিলেন ''সত্যিই যদি ভালোবেসে থাকো, তবে চুপ থেকো" মৃত্যু শিয়রে দাঁড়িয়ে প্রেমিকের, তবু এটুকুই তাঁর উচ্চারণ। জেবউন্নিসা এমনি ছিলেন। পরে তাঁর একটি কবিতায় আকিলের কথা লিখেছিলেন তিনি। সেখানে আকিল যেন প্রশ্ন করছেন, ''প্রেমিকের ভাগ্যে কী লেখা আছে?" কবিতাতেই তাঁর উত্তর দিচ্ছেন জেবউন্নিসা —

''পৃথিবীর তৃষ্ণার জন্য আত্ম বলিদান" আকিল চলে যাওয়ার পর জীবনটা আরো যেন অন্যরকম হয়ে গেল জেবের। রাজকন্যা সুলভ তো নয়ই, বরং অনেক বেশী করে সাধিকার মতো। নিজেকে পড়াশোনা আর দানধ্যানের মধ্যেই ডুবিযে দিলেন - তিনি। নিজের বাৎসরিক খোরাকির চার লক্ষ টাকার বেশির ভাগটাই বিলিয়ে দিতেন পন্ডিত, অনাথ শিশু ও বিধবাদের মধ্যে। মক্কা, মদিনার তীর্থযাত্রীদের জন্য টাকা খরচ করতেও কসুর করতেন না।

নিজের উদ্যোগ নিয়ে তৈরি করলেন একটি গ্রন্থাগার। সেখানে মাসমাইনে দিয়ে লিপিকরদের রাখলেন পুঁথি নকল করতে। জেবউন্নিসা নিজেও ছিলেন একজন লিপিকর।

মোল্লা সফিউদ্দিন তাঁর পৃষ্ঠপোষকতাতেই কোরানের আরবি ভাষা ফার্সিতে অনুবাদ করলেন। শোনা যায় জেবের কাছে কাশ্মীরি পুঁথির একটি বড় সংগ্রহ ছিল। যার একটা বড় অংশ ছিল হিন্দু শাস্ত্রীয় গ্রন্থ।

দরবারের লোকজন অবাক হয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন, রাজকন্যা দিনে দিনে যে সাধিকার বেশ ধরছেন। সাজগোজ করেন না চোখে কাজল টুকুও দেন না। অলঙ্কার বলতে শুধু গোলাপি মুক্তোর মালা, পরনের পোশাকের রং সাদা। সাদামাটা পোশাকই ছিল তাঁর বেশ।

দরবারের কোনো কিছুর প্রতিই আর আসক্তি রইল না। শুধু প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসতেন ভাই মহম্মদ আকবরকে। সেই ভালবাসাই কাল হল। আকবর বাবার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। কিছু দিনের মধ্যেই আজমীরের কাছে মুঘল সেনারা তাঁকে পরাজিত করল। আকবরের শিবির থেকে পাওয়া গেল জেবউন্নিসার একাধিক গুপ্ত চিঠি। ঔরাঙ্গজেব আর সইতে পারলেন না। মেয়েকে কুড়ি বছরের জন্য সেলিমগড় কেল্লার জেল খানায় আটক করলেন। অথচ কোনও এক সময় দরবারে কোনও সমস্যা সমাধানে এক মেয়েকে সব থেকে বেশি ভরসা করতেন ঔরাঙ্গজেব। রাজকন্যার যেকোন সিদ্ধান্তে শুধু দরবারি সিলমোহরই পড়তনা, তা পাঠিয়ে

দেওয়া হত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। জেলে থাকার দিনগুলি জেবউন্নিসার কাটত কবিতা নিয়ে। দীর্ঘ কুড়ি বছর হাজতে কাটালেন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। ঔরাঙ্গজেব মেয়ের সৎকার ধূমধামের সঙ্গেই করেছিলেন। পিতৃ হৃদয়ের মর্মবেদনার থেকে প্রচারসর্বস্বতাই ছিল এর লক্ষ্য। পিতা-পুত্রির বাৎসল্য-প্রতি বাৎসল্যের গভীরতা তো দূরের কথা সম্পর্কটি শেষের দিকে দাঁড়িয়েছিল প্রবল বাদী-বিবাদীর সে জায়গা থেকে অতিরিক্ত ঘটা করে কন্যার মৃত্যুর পর তাকে স্মরণ বা সম্মাননা জানানোর মধ্যে আত্ম-প্রতারনা ছাড়া আর কিছু থাকে না। তবে পিতৃ হৃদয়ের যে, স্নেহের ফল্গুধারা যা জেবউন্নিসার প্রতি বর্ধিত হয়েছে অন্তঃসলিলা হয়ে হয়ত বা বহমান ছিল যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে কন্যার মৃত্যু পরবর্তী ক্রিয়া কর্মের মধ্যে।

তথ্যসূত্র :

মোঘল বিদূষী, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাদা কালো ছবি

আশিস রায়
প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

দিনটা এখনো মনে আছে। দু'হাজার সাতের বাইশে ফেব্রুয়ারি। তখন কলকাতায়। মোহিতবাবুকে টেলিফোনে বললাম — ''দুপুরের আগেই তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাব। তখন ফ্ল্যাটে থাকবে তো? চল্লিশ বছর পর দেখা হবে — দেখলে চিন্‌তে পারব তো?'' জবাব দিলেন — ''আমি এখন বাড়ির কড়ি-বরগার মতো হয়ে গিয়েছি। যখন আসবে তখন ফ্ল্যাটে আমি একা-ই থাকব - তুমি এলে আমিই দরজা খুলে দাঁড়াব কিন্তু ভুলেও জিগ্যেস কোরো না — ''আপনি মোহিতবাবু তো?''

সিটি কলেজ থেকে এক যুগ আগে রিটায়ার করেছেন - কিছুতেই পেনশনটা হচ্ছে না। জঙ্গিপুর কলেজ থেকে একটা জয়েনিং রিপোর্ট পাওয়া দরকার। অনেক অনুনয় করে আমাকে চিঠিতে লিখলেন — ''তুমি যদি কলেজে গিয়ে একটু চেষ্টা করো তাহলে ঝঞ্ঝাটটা মিটে যায়।'' বার কয়েক কলেজে গেলাম। অফিস বলল কোন্ বছর জয়েন করেছিলেন না জানতে পারলে কিছুই করা যাবে না। সে কথা জানিয়ে মোহিতবাবুকে চিঠি দিলাম। উত্তরে লিখলেন — ''সাল মাস কিছুই মনে নেই আমার — শুধু মনে আছে তখন শীতকাল ছিল আর কলেজে যেদিন প্রথম ঢুকি সেদিন একটা ষাঁড় কলেজ-গেটের পাশে দাঁড়িয়েছিল।''

এই আমার চেনা মোহিতবাবু।

চল্লিশ বছর পরে যখন দেখা হল তখন আমাদের সেই চেনা মানুষটাকে খুঁজে পেলাম না। কালো পাড়ের তাঁতের ধুতি-পরা মোহিত বাবুর পরনে পাজামা। চারমিনার সিগারেট ছেড়েছেন - জর্দার সঙ্গে পান ধরেছেন। মাথাভর্তি কালো কোঁকড়ানো চুল তখন উধাও। জিগ্যেস করলাম — ''জঙ্গিপুর কলেজের কথা - আমাদের কথা আর কি তোমার মনে পড়ে?'' কথার উত্তর না দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পাশের ঘরে চলে গেলেন। পরক্ষণেই ফিরে এলেন। হাতে একখানা ছোট্ট সেকেলে সাদা-কালো ফটোগ্রাফ। হাতে দিয়ে বললেন — ''দ্যাখো এটা।'' তাকিয়ে দেখি চৌষট্টি সালে তোলা একখানা ছবি। ছবিতে তিনজন মানুষ। চিনতে কষ্ট হল না। আমাদের কলেজের বাংলার স্যার কালীবাবুর জঙ্গিপুরের বাসার চিলে-কোঠার দরজার মুখে ওঁর দুপাশে বসে আছি মোহিতবাবু আর আমি। অবাক হয়ে মোহিতবাবুর মুখের দিকে তাকাতেই বললেন — ''ফটোটা আমার বিছানায় তোশকের নিচেই থাকে - ওটা আমার কাছে তাজমহলের চেয়েও দামি।''

দু'হাজার সাতের পর প্রায় দশ বছর কেটে গেছে। ঐ ছোট সাদা-কালো ছবিটা মোহিতবাবুর বিছানার নিচে এখনো রাখা আছে কিনা কে জানে!

দরজিপাড়ার হালহকিকত : একটি সমীক্ষা

মানব সভ্যতার অগ্রগতির অন্যতম চিহ্ন তার পোশাক-পরিচ্ছদ। প্রকৃতিগত আবহাওয়ার অনিবার্য প্রভাব শিরোধার্য করে মানুষ ঘরবাড়ির সঙ্গে সঙ্গে পোশাক নির্বাচন করেছে। সেই জন্য আমরা মানুষের অন্যান্য সংস্কৃতির মতো পোশাক-সংস্কৃতির বৈচিত্র্য লক্ষ্য করি। গ্রীষ্ম প্রধান দেশের এক রকম পোশাক, শীত প্রধান দেশের আবার অন্যরকম। বৃষ্টিপ্রবণ এলাকায় এক রকম, আবার মরু অঞ্চলে অন্যরকম। তবে বর্তমান বিশ্বায়িত দুনিয়ায় আর প্রকৃতি নয়, বহুজাতিক কোম্পানী অন্যান্য কিছুর মতো মানুষের পোশাক নির্বাচন করে দিচ্ছে। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা, পাহাড়-সমতল-মরুভূমি নির্বিশেষে একই রকম পোশাক বিক্রি করতে পারলে তাদের মুনাফার অঙ্ক বাড়ে। হচ্ছেও তাই। সেই পোশাক যাঁরা তৈরি করেন তাঁদের জীবন ও জীবিকা নিয়ে আজকের প্রতিবেদন। বলাবাহুল্য বড়ো কোম্পানীর পোশাক কারখানার কারিগর কিংবা শহরের বড়ো বড়ো টেলারিং শপ আমাদের আলোচনায় আসলেও প্রধান্য পাবে নিম্ন বা নিম্ন-মধ্যবিত্তের সাধারণ দরজি।

জঙ্গিপুর মহকুমার প্রায় প্রতিটি শহর, গঞ্জ বা গ্রামে কমবেশি দরজি আছেন। যাঁরা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কাপড়ের তৈরি যে কোনো পোশাক ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী তৈরি করেন। শুধু জঙ্গিপুর পৌর এলাকার এপার-ওপার মিলিয়ে শতাধিক দরজি দোকান আছে। তবে সবাই সমান দক্ষ নন কিংবা সবাই সমান রোজগার করেন না। স্মার্ট টেলার, বচ্চন টেলার, গুডলাক টেলার কিংবা বোম্বে টেলারগুলো রীতিমতো ক্ষুদ্র শিল্পপতিদের মতো কাজ করেন। বছরের দশমাস তাঁরা কমবেশি ১০/১২ জন কর্মী নিয়ে কাজ করেন। ঈদ বা পূজোর সময় সংখ্যাটা ২৫/৩০ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এই সমস্ত দোকানের মালিকরা মূলত 'কাটার মাস্টার'। বাকি কর্মীরা শুধু সেলাইয়ের কাজ করেন। কেউ কমিশন ভিত্তিক, কেউ দৈনিক মজুরি ভিত্তিক। এঁদের দৈনিক গড় আয় ৩০০-৩৫০ টাকা। এঁরা মূলত সারা বছরেই কাজ পান। তবে শহরের ৩০ শতাংশ দোকান বাদ দিলে বাকিদের সাধারণ গোত্রেই ফেলা যায়। তাঁরা উৎসবের দুটো মাস নাওয়া খাওয়া ভুলে কাজ করলেও বাকি দশমাস কাজের অত চাপ থাকে না। তবে দু-চারটি কর্মচারী রেখে কাজ করাতে না পারলেও নিজে কেটে সেলাই করে রোজগার করেন। এঁরা গড়ে মাসিক আট ন'হাজার টাকা রোজগার করেন। সংসারে দু-চারজন পোষ্যকে খাইয়ে-পরিয়ে লেখাপড়ার খরচ ও চালিয়ে নেন কষ্ট করে। তবে জঙ্গিপুর পৌর এলাকার বাইরের চিত্র কিন্তু এমন নয়। বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে আমরা যে তথ্য সংগ্রহ করেছি তাতে গ্রামগঞ্জে চিত্র ভালো নয়। শুধুমাত্র একজনের রোজগারে সেখানে সংসার চালানো দায়। পাশাপাশি অন্যকোনো সংস্থান না-থাকলে সংসার চালিয়ে লেখাপড়া কিংবা অসুখ-বিসুখের সময় ওষুধ কেনার পয়সা থাকে না। অনেক দরজির আবার দোকান ঘর বানানোর সামর্থ্য নেই, এমনকি একটি সেলাই মেশিন কেনার। ফলে তারা অন্যের দোকানে কাজ খোঁজেন। কাজ জোটে সেই উৎসবের দুটি মাস। অন্য সময় বাধ্য হয়ে অন্য কাজ করতে হয়। তবে আশার কথা বিশ্বজুড়ে রেডিমেড পোশাকের প্লাবনের মধ্যেও এই পেশায় তার বিশেষ প্রভাব পড়েনি। এখন শহরের লেডিস টেলারগুলোও চলে রমরমিয়ে। শহরে শিক্ষিত মেয়েরা চিরকালই ফ্যাশান দুরস্ত। বিশেষ করে ১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সী মেয়েরা যে কোনো ছুতোতেই বিস্তর কেনাকাটা করেন। তার একটি ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে এই পেশায়। বিভিন্ন ডিজাইনের চুড়িদার থেকে শুরু করে শাড়ির রঙ মিলিয়ে ব্লাউজ বানাতে শুধু উৎসবের কটা দিন নয়, দক্ষ

দরজিরা ব্যস্ত থাকেন সারা বছর। ফলে রোজগারও হয় ভালো।

বর্তমানে মেয়েদের দ্বারা পরিচালিত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে জঙ্গিপুর মহকুমার শহর ও শহরের বাইরে বেশ কয়েকটি পোশাক তৈরির কারখানা চলছে। এখানে একযোগে অনেক মেয়ে কাজ করে থাকেন। মেয়েদের হাতে অর্থ থাকলে সংসারের দায়দায়িত্ব অনেক ভালোভাবে পালিত হয়, এটা সমাজবিজ্ঞানের সমীক্ষার ফল। অতএব নিম্নবিত্ত পরিবারের অনেক মহিলা সংসারের কাজ সামলে কোনো দরজি কিংবা রেডিমেড পোশাকের দোকানদারের সঙ্গে চুক্তি করে ঘরে বসে সায়া কিংবা নাইটি কিংবা ফলস্-পিকো বানানোর কাজ করছেন। বড়ো দরজি দোকানদার কোনো গৃহিনীর সঙ্গে চুক্তি করে শুধু বছরের দুটো মাস নয়, সারা বছর বোতাম লাগানো কিংবা হাতে সেলাইয়ের কাজগুলি করিয়ে থাকেন।

আলোচনা দীর্ঘায়িত না করে শহর-গ্রাম-গঞ্জ জুড়ে এই পেশার মানুষদের মধ্যে সমীক্ষা করে যে তথ্য আমরা পেয়েছি, তা এখানে উল্লেখ করব। প্রায় ৫০ জনের মধ্যে এই সমীক্ষায় একটি অদ্ভুত তথ্য আমরা পেয়েছি ঃ এই অঞ্চলের ৯০ শতাংশেরও বেশি দরজি মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত। এই তথ্যসূত্র ধরে রাজ্যের অন্যান্য জেলার খোঁজ খবর নিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় ঃ বরাবরই এই পেশায় মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের সংখ্যাধিক্য।

- বাণীপুর, ঘোড়শালার আব্বাশ আলি, বয়স - ৪৪ বছর, বিবাহিত, শিক্ষা - চতুর্থ শ্রেণি, দোকানের ভাড়া মিটিয়ে মাসিক আয় গড়ে ৪০০০ টাকা, নির্ভরশীল সদস্য সংখ্যা - ৪ জন। এই এলাকায় আরও দশটি এরকম দরজি-দোকান আছে।
- কাঁকুড়িয়া, মিয়াপুরের আসরাফ সেখ, বয়স - ৪২ বছর, বিবাহিত, শিক্ষা - নবম শ্রেণি, নিজস্ব দোকান, মাসিক গড় আয় - ৪০০০ টাকা, নির্ভরশীল সদস্য সংখ্যা - ৪ জন, এই এলাকায় আরও চারটি দোকান আছে।
- লক্ষ্মী জনার্দনপুর, জঙ্গিপুরের রঞ্জিত দাস, বয়স - ২৪ বছর, অবিবাহিত, শিক্ষা - উচ্চ মাধ্যমিক, বাড়িতেই দোকান, মাসিক গড় আয় - ৩০০০ টাকা, নির্ভরশীল সদস্য সংখ্যা - ১ জন।
- ইসলামপুর, জঙ্গিপুরের বাবলু সেখ, বয়স - ৪২ বছর, বিবাহিত, শিক্ষা - ষষ্ঠ শ্রেণি, দোকানের ভাড়া মিটিয়ে মাসিক আয় - ৭০০০ টাকা, উৎসবের সময় বাড়তি কর্মী নিতে হয়। নির্ভরশীল সদস্য সংখ্যা ৪ জন।
- ইসলামপুর, জঙ্গিপুরের নাসিমা খাতুন, বয়স - ২৪ বছর, অবিবাহিতা, শিক্ষা-জঙ্গিপুর কলেজে বি.এ. দ্বিতীয় বর্ষে পাঠরতা, বাড়িতেই নিজস্ব সেলাই মেসিনে কাজ করে মাসিক আয় - ১৮০০ টাকা। মা বিড়ি শ্রমিক। উৎসবের সময় বোনও কাজে হাত লাগায়।
- আহিরণের সেখ গোলাম মাহ্মুদ, বয়স - ৩২ বছর, অবিবাহিত, শিক্ষা - উচ্চ মাধ্যমিক, দোকানের ভাড়া মিটিয়ে মাসিক গড় আয় ৫০০০ টাকা, নির্ভরশীল সদস্য বাবা ও মা।
- আহিরণের সেখ আব্দুস সামাদ, বয়স - ৪২ বছর, বিবাহিত, শিক্ষা - মাধ্যমিক, দোকানের ভাড়া মিটিয়ে মাসিক গড় আয় - ৫৫০০ টাকা, নির্ভরশীল সদস্য সংখ্যা - ৫ জন।
- ইসলামপুর, জঙ্গিপুরের আনারুল সেখ, বয়স - ৩৪ বছর, বিবাহিত, শিক্ষা- সপ্তম শ্রেণি, দোকানের ভাড়া মিটিয়ে মাসিক আয় - ৪০০০ টাকা, নির্ভরশীল সদস্য সংখ্যা - ৩ জন।
- বদরপাড়া, সাহেববাজারের তোফাজুল হোসেন, বয়স - ৬৪ বছর, বিবাহিত, শিক্ষা - অষ্টম শ্রেণি, দোকানের ভাড়া মিটিয়ে মাসিক আয় - ৫০০০ টাকা, নির্ভরশীল সদস্য - ৬ জনের মধ্যে একজন বিড়ি বাঁধেন, দুই ছেলে

বাবার পেশাতেই যুক্ত।

- বদরপাড়া, সাহেববাজারের সুখু সেখ, বয়স - ৪৬ বছর, বিবাহিত, শিক্ষা - সপ্তম শ্রেণি, রঘুনাথগঞ্জ শহরের স্মার্ট টেলারের কর্মী। মাসিক আয় ৬০০০ টাকা, নির্ভরশীল সদস্য - ৭ জনের মধ্যে ১জন বিড়ি বাঁধেন, দুইছেলে রাজমিস্ত্রীর কাজ করেন।
- বদরপাড়া, সাহেববাজারের গুলজার সেখ, বয়স - ৪২ বছর, বিবাহিত, শিক্ষা - পঞ্চম শ্রেণি, ম্যাক্স টেলারের কর্মী, মাসিক আয় - ৪০০০ টাকা, নির্ভরশীল সদস্য সংখ্যা - ৫ জন।
- সাহেবনগর, আদিকান্তপুরের আবদুর রসিদ, বয়স - ৫২, বিবাহিত, শিক্ষা - অষ্টম শ্রেণি, রঘুনাথগঞ্জ শহরে ভাড়া করা দোকান — 'লেটেস্ট টেলার্স', ৬০ হাজার টাকা সেলামীতে ঘর নিয়ে মাসিক ১০০০ টাকা ভাড়া মিটিয়ে মাসিক গড় আয় - ৮০০০ টাকা। নির্ভরশীল ৪ জন সদস্যের মধ্যে ৩ ছেলেমেয়ে পড়াশোনা করে।

অধ্যাপক নুরুল মোর্তজার তত্ত্বাবধানে তথ্য সংগ্রহের কাজ করেছেন জঙ্গিপুর কলেজের বাংলা বিভাগের মিঠু সেখ, প্রসেনজিৎ দাস, তাহেরা খাতুন, মহঃ সেলিম আখতার খান, আমির সোহেল প্রভৃতি ছাত্রছাত্রীরা।

INDIAN ECONOMY : HOPPING FOR BETTER TOMORROW.

Pritimoy Majumder
Associate Professor
Department of Commerce

This is an era when India has hundreds of millions of mobile and net users, most banks have shifted their operations to electronic platforms and online sales of products were bound to open up sooner rather than latter (protests and agitations against them are nothing but a futile attempt to block the future.). More than three decades ago, renowned futurologist Alvin Toffler wrote about what he described as the three waves of civilization: the agriculture wave, that lasted several thousand years; the industrial wave that we have all seen over the past five centuries or so; and finally, the third wave of knowledge-based economies of the 21st century. The third wave he explained that all the industrial activity that drove the second wave would continue in the third wave but on a higher technology basis. What a comment or prediction it is! All over the world people, at present, are feeling the third wave more positively.

A total change is being noticed since 1991 particularly in India's outlook. A foreign exchange crisis in 1991 induced India to abandon decades of inward-looking socialism and adopt economic reforms that have converted the once-lumbering elephant into the latest Asian tiger. When the reforms began in 1991, critics claimed that India would suffer a "lost decade" of growth as in African countries that supposedly followed the World Bank-IMF model in the 1980s. They warned that opening up would allow multinationals to crush Indian companies and it would hit poor people and regions. All of these dire predictions proved wrong.

Almost a quarter of Indian districts have recorded some sort of Maoist violence, and corruption is a major issue. Today License, Permit and Quota Raj is a thing of past. The underlying belief is that commerce and business are not matter to restricted to fixed national boundaries; they are global phenomena. Industrial organizations have now become more efficient and market responsive. Country's exports are on the increase. In the modern days Globalization has launched all spheres of life such as economy, education, technology, cultural phenomenon, social aspects etc……the term global village is also frequently used to highlight the significance of the Globalization.

In 2008 the world economy faced its most dangerous crisis since the Great Depression of the 1930s. The 'Financial Crisis of 2008', also called the US Meltdown, has its

origin in the United States but gradually extended over a period of time and eventually brought the entire world under its grip. India's stock market started falling. On 10 October, Rs.250,000 crore was wiped out on a single day bourses of the India's share market. Indian exports have run into difficult times. Manufacturing sectors like leather, textile, gems and jewellery have been hit hard because of the slump in the demand in the US and Europe. Indian exports fell. Again reduction in demand affected the Indian gems and jewellery industry, handloom and tourism sectors. Around 50,000 artisans employed in jewellery industry have lost their jobs as a result of the global economic meltdown. Further, the crisis had affected the Rs. 3000 crore handloom industries. Being a part of global village India can't avoid the effect of depression.

China, which has been the engine growth for the world economy, is now facing challenges, commodities prices are struggling there at the bottom. Even Wal-Mart, the world's largest retailer, which was once the darling of investors, is facing a challenge to report growth. Condition of Greece is well-known to us. Crude oil which, a few years back, was predicted to $200 per barrel is now being forecast to touch just $20 per barrel. As per the World Bank report the GDP growth (annual %) of some important countries in the world like USA, UK, Japan, France, China and India is 2.4, 2.9, -0.1, 0.2, 7.3 and 7.3 respectively in the year 2014. Europe's downward economy, Fed's likely rate high and how low China's growth can go are the major points of discussion for the world economy.

India faces so many hurdles particularly since 2008 for which we can't blame the industrial sector as well as the government only for its slowdown. Global slowdown had reduced the demand for Indian products and services and poor monsoons for 2 years in a row have cut the purchasing power of the rural population. But in this context, at present, the economic condition of India is not in bad shape at all.

Reliance tops the list in the year 2015 with its net profit Rs. 23,566 crore – an improvement by 5% and the growth rate of TCS is 4% with a net profit of Rs. 19,852 crore. Wipro earns a profit of Rs. 8,661 crore up by 9%. Hindustan Zinc has increased by 18% to Rs. 8,661 crore. Interesting picture of smart growth in case of Videocon who scores profit of Rs. 5,120 crore recovering from losses of Rs. 2,826 crore it incurred last year. Top four of five companies ranked by sales are in the Oil & Gas sector. Tata Motors has seen its overall sales rise to Rs.2,62,796 crore – a rise of almost 13%. Maruti Suzuki, TVS Motors and Ashok Leyland saw a rise of their sales by 14%, 23% and 34% respectively. HUL saw a double digit growth as well as Godrej Consumer, Dabur and Nestle saw a higher growth. Even FMCG companies are also showing decent growth.

So, we can believe that the pain has gone and days ahead are for gains. Even the world economy is slowing down India Inc. is in a mood to grab the opportunities. India

could emerge as the hot destination in the world and in this connect we can add a comment of Mark Zuckerberg, “We can’t connect the world without connecting India”. The IMF is also forecasting that the country will continue to be the world’s fastest growing economy in the fiscal year from April 2016 to March 2017 with growth of 7.5 per cent, up from a predicted 7.3 per cent during the previous 12 months. It becomes very important for the government now to pass the long term pending GST and Land bills to reinsure investors’ confidence. GST bill needs for uniform taxation structure in the country, which will boost trade and commerce activity. In this moment, reduction of political acrimony is urgently required which has left the parliament ended without passage of single reform legislation.

EQUIVOCATION OF EVIL & THE DISCOURSE OF AMBIVALENCE IN *MACBETH*

Basudeb Chakrabarti
Associate Professor in English and HOD
Department of English

Much has already been stated about the hermeneutics of equivocation and its various ramifications in *Macbeth*. For instance, when the Porter "jokes" about equivocation, states Graham Holderness, "he foreshadows his master's use of the same term later in the play, when Macbeth begins: [t]o doubt the equivocation of the fiend/That lies like truth" (Holderness 61). This links the play to the Gunpowder Plot of 1605 and other kinds of opposition to James I's government by the Catholics who regarded equivocation as a legitimate form of resistance to tyranny. S. L. Bethell, as quoted by Kenneth Muir, opines that the "whole atmosphere of treason and distrust which informs *Macbeth* found a parallel in the England of the Gunpowder Plot" (Muir xxvii). Henry N. Paul's fascinating work *The Royal Play of Macbeth: When, Why and How it was Written by Shakespeare* (1950), again aims to link *Macbeth* to the fall-out from the Gunpowder Plot and he shows how paltering in a double sense, as the witches do, runs throughout the play and can be related to the theme of destabilizing the supposedly accepted world order. This was followed by Stephen Booth's *Indefinition and Tragedy* (1983) where he argues that the "most obvious examples of the insufficiency of limits are the equivocations that are one of the play's recurrent topics" (Booth 98). Finally, with Malcolm Evans the theme of equivocation comes most strongly to accommodate the discourse on subversion in *Macbeth* as "imperfect speaking" spreads across the text and upsets the hierarchies it seeks to affirm (Evans 14).

Similarly plural and pregnant are the ways in which the concept of evil has been deciphered in *Macbeth.* Edward Dowden followed Hazlitt and Coleridge in his *Shakespeare: A Critical Study of His Mind and Art* (1877) to see *Macbeth* as "concerned with the ruin or restoration of the soul, and of the life of man"; "its subject is the struggle of good and evil in the world" (Dowden 224). Such critics saw the witches as prototyping evil: Hazlitt called them "abortive" (Hazlitt 17) and Coleridge felt they were "fearfully anomalous" (Coleridge 207). With A. C. Bradley the stress significantly shifted to the character and the concept of evil got internalized: "… the evil against which [the order] asserts itself, and the persons whom this evil inhabits, are not really something outside this order, so that they can attack it or fail to conform to it; they are within it and a part of it" (Bradley

27). G. Wilson Knight's 'interpretation' initially finds that "*Macbeth* is Shakespeare's most profound and mature vision of evil" and this evil is absolute, supernatural and objective (Knight 140). However in his subsequent book *The Imperial Theme* (1931), Wilson Knight modifies this vision of evil by presenting a counter-weight of life and death themes making *Macbeth* a play about metaphysical oppositions as well. L.C. Knights followed suit in his 1933 essay "How Many Children had Lady Macbeth?" by developing upon the binaries, already established by Wilson Knight, of good/evil, order/disorder, the only addition being the concept of "holy supernatural" as opposed to the "supernatural soliciting" of the witches (Knights 33). Eugene M. Waith's essay "Manhood and Valour in Two Shakespearean Tragedies" (1950) however, broke free from viewing evil as exclusively metaphysical by drawing upon the cultural concepts of manhood and effeminacy. The classical concept of *ferritus* might have constituted the basis in Waith's concept of the beast/evil but it does assume a pronounced socio-cultural dimension as Macbeth faces the conflict between the "narrow concept of man as the courageous male and the more inclusive concept of man as a being whose moral nature distinguishes him from the beasts" (Waith 263). The question of evil got further problematized by L. C. Knights' *Some Shakespearean Themes* (1959) where he stated that "*Macbeth* defines a particular kind of evil the evil that results from a lust for power" (Knights 120). Knights opines that it is human nature which defines and judges the evil in *Macbeth* and the most indispensible element of this nature is its ability and need to form relationships; it is this need which produces the human order and makes killing wrong. Power-motivations as manifesting evil form the focal point of Jan Kott's monumental work *Shakespeare Our Contemporary* (1964) where man's capacity for destruction is shown to demonstrate an acute sense of absurdity and *Macbeth* as anticipating such a post-holocaust vision. Wilbur Sanders moved one step further when he placed Kott's absurdity in terms of what Friedrich Nietzsche in *The Birth of Tragedy* phrased as "strong pessimism" illustrating a "penchant of mind for what is hard, terrible, evil, dubious in existence, arising from a plethora of health, a plentitude of being" (Sanders 253).

In the last two decades of the twentieth century the question of determining the precise nature of evil that *Macbeth* illustrates took a significant turn. The dominant mid-twentieth century perspective that the play shows the disruption of order by evil and the eventual restoration of harmony is subtly critiqued now. Harry Berger Jr. in "The Early Scenes of *Macbeth*: Preface to a New Interpretation" (1980) contends that *Macbeth* is centrally concerned with "dramatizing failures or evasions of responsibility correlated with problematic structural tendencies that seem benign because it is in the interest of self-deceiving characters to view them that way" (Berger 72). Reminding us of the primitive forms of exchange which the anthropologist Marcel Mauss analyses in *The Gift*

(1925), Berger shows that Macbeth does not portray a harmonious social order which is disrupted by Duncan's murder, but a highly competitive society in which the bestowal of favours and the expression of gratitude are aspects of the competition. On both a literal and symbolic level, the natural basis of this warrior society being blood, Macbeth's killing of Macdonwald anticipates Macduff's killing of Macbeth and also relegates Duncan's meekness ill-adapted to this world. This and James L. Calderwood's subsequent view that Macbeth is a unique scapegoat, a *pharmakos*, incorporating the ideas both of medicine and poison, "both the disease of violence his community suffers from and its cure" that the motif of equivocation, though not noticed by Calderwood, swamps upon the text to blur the very parameters that constitute the genesis of evil (Calderwood 100). The discourse that occupies centre-stage in *Macbeth*, as Alan Sinfield rightly points out in "*Macbeth*: History, Ideology, and Intellectuals" (1986), is that the play tries to make a distinction between the supposedly legitimate violence of the state and the supposedly illegitimate violence of those who dissent from or oppose its authority; it is this illegitimate violence that *Macbeth* seeks to label as evil. The mystification that thus comes to suffuse the concept of evil has its roots firmly implanted in the theme of equivocation. The play in assuming to vouchsafe one clear meaning simultaneously ensures a textual reservation which contradicts the initial supposition. For if conventional wisdom affirms that *Macbeth* is a statement of orthodoxy in terms of its presentation of the sovereignty of King Duncan which Macbeth's evil act of tyrannicide/regicide violates and overturns, the play also simultaneously equivocates to override all such ethical, moral and political propositions. This it does not necessarily by mitigating the burden of Macbeth's evil, but by urging us to reassess the supposed goodness of Duncan's sovereignty against which Macbeth's villainies are judged and also by critiquing Malcolm's role in ushering an ideal kingship.

Let us first take into account the inputs that the text provides us in projecting Duncan and the nature of his sovereignty as untainted. We see that Duncan's virtues are so overwhelming that even the Macbeths, as they prepare to murder him, praise him as well. Macbeth is unsure, telling his wife of Duncan, "We will proceed no further in this business. / He hath honoured me of late" (1.7.31–32)[1]. Lady Macbeth too, famously, procrastinates before the murder: "Had he not resembled/ My father as he slept, I had done't" (2.2.12–13). Duncan in fact makes treason a challenge: he is a gracious leader and a father figure. And Shakespeare helps establish the legitimacy of Duncan's rule through a strain of natural imagery running throughout the play. We are reminded of Derek Traversi who writes how Duncan's function in the play lies in "the images of beauty and fertility which surround his person and confer substance and consistency upon the 'symbolic' value of his rule" (151). As the sun, Duncan shines gratitude and warmth on

all his noblemen who, as a result, appear "like stars" (1.4.41). Further, he claims "to plant" Macbeth and "will labour/ To make [him] full of growing" (1.4.28–29). And as Banquo puts it, he can serve as Duncan's "harvest" (1.4.33), the fruits of his careful nurture. Such natural imagery, reinforcing Duncan's sovereignty, contrasts explicitly with the images surrounding Macbeth. Even as Duncan exalts his noblemen as stars, Macbeth finds the light of stars threatening: "Stars, hide your fires! / Let not light see my black and deep desires" (1.4.50–51). Lady Macbeth also celebrates such darkness, summoning "thick Night" filled with the "dunnest smoke of Hell" (1.5.48–49). This strain of imagery culminates with Macbeth's "Come, seeling Night" speech as he prepares to get rid of Banquo and Fleance (3.2.46–55).

Yet no sooner do we tend to polarize Duncan's "golden blood" (2.3.105) with Macbeth's supernatural dagger, the good against the evil, the text catapults us to equivocate Duncan and his brand of politics. And when we do so, we find that while opposing Duncan to Macbeth, sovereign to traitor, Shakespeare also exposes, appropriately, how "Fair is foul, and foul is fair" (1.1.12). A paradoxical combination of traitor and sovereign becomes glaring in Duncan who, despite his evident virtues, demonstrates a host of striking iniquities compromising what we regarded as an idealized portrait of sovereignty and more importantly, our hitherto formulated perception of unipolar evil in *Macbeth*. Duncan is, after all, a bemused king. His first line in the play is a question: "What bloody man is that?" (1.2.1), and this interrogative slant continues incessantly into the subsequent sections of the play as well: "Who comes here?" (45), "Whence cam'st thou?" (48), "Is the execution done on Cawdor? Are not/ Those in commission yet returned?" (1.4.1–2,), "Where's the Thane of Cawdor?" (1.6.20). He seems almost as clouded about the rapidly changing state of war as he is about his thane of Cawdor. When not interrogating his subjects for crucial information on the war, Duncan plays the perfect audience offering brief affirmations of the speeches delivered by his subjects: "O valiant cousin, worthy gentleman." (1.2.24), "Great happiness!" (60), "My worthy Cawdor!" (1.4.47). Duncan's demeanor, that is to say, is thus hardly sovereign, in the sense of a ruler governing over his subjects and nation. Instead, he seems more dependent upon them, relying on their narratives in order to rule effectively. In addition to his questioning stance, however, Duncan seems, more worryingly for us, completely out of touch with his environment. In some of the play's apparently funniest lines, Duncan famously describes his soon-to-be coffin, namely Macbeth's castle, as a "pleasant seat" whose "air/ Nimbly and sweetly recommends itself/ Unto our gentle senses" (1.6.1–3). Even if we hesitate to fault Duncan for trusting the hospitality of his recently-honoured subject, the king's timing in electing his son as his successor makes him more culpable. *Macbeth*'s immediate narrative sources record that the Scottish practice of succession, tanistry, would place Macbeth as

Duncan's successor, not Malcolm: through elective kingship or tanistry, succession was determined by alternating between royal lines, rather than simply through primogeniture. Yet Duncan reverts to primogeniture rather than tanistry which would favor Macbeth and nominates Malcolm as king as part of the postwar spoils, an action that is ill-timed and impolitic given Macbeth's own recent triumph in the war in contrast to Malcolm's narrowly averted captivity.

Also Duncan's "duplicity", as it has been termed by R. W. Desai in his remarkable essay "Duncan's Duplicity" (1998), is all too evident in the early scenes of the play and it goes a long way to make him responsible for the tyrannicide/regicide that Macbeth eventually perpetrates. With the sole intention to jeopardize Macbeth's rightful claim to the throne of Scotland, Duncan has been extremely sly in his rulership and this begins to take shape when for no apparent reason he couples the names of Macbeth and Banquo just when the Captain has presented a detailed account of Macbeth's singlehanded prowess in the battlefield. Aware of the dangers implicit in allowing Macbeth alone to take away all the honours of the battlefield, Duncan craftily embarks upon his calculated bid to mitigate Macbeth's accomplishments by dividing the glories between him and Banquo. That it is merely out of courtesy to the King that The Captain reverts to the plural pronoun: "So they/ Doubly redoubled strokes upon the foe" (1.2.38) – becomes all the more explicit when, as if to further accentuate Macbeth's unaided feat, Ross enters with a fresh description of Macbeth's mighty performance, describing him as "Bellona's bridegroom" (1.2.54), with no reference to Banquo. The next instance of injustice on Macbeth occurs when the promise of reward commensurate with his military feats is sidelined by Duncan. In Act 1, Scene 3, Ross and Angus bring the new title "Thane of Cawdor" (103) to confer upon Macbeth and it is made conspicuous that this salutation is only "an earnest"(102) not the actual reward which should follow. However, on actual appearance before Duncan in the subsequent scene, Macbeth is greeted with a glaring disparity between promise and its non-fulfillment, for apart from ratifying the title "Thane of Cawdor" Duncan practically does nothing. He talks of enlargement and increase: "I have begun to plant thee, and will labour/ To make thee full of growing" - but decidedly refrains from translating these verbal assurances into tangible reality. According to the prevalent Scottish political hierarchy, Duncan's "you whose places are the nearest" (1.4.36) refer to that of the earls, but Duncan prefers to circumscribe Macbeth within the limits of thaneship for to reward him with an earldom would situate him dangerously close to the crown. Fully aware of the intricacies of the competitive society, of which Harry Berger Jr. elaborates substantially, Duncan is meticulous to weave a web of expectation and partial fulfillment in which his leading subjects would get enmeshed, each one hopeful of

advancement and suspicious of his rival. But this is a precarious game to play for the moment Duncan feels he has been able to vanquish all his foes than he is outdone by Macbeth. It is thus manifest that if the text makes Duncan benign, kindly and, to quote Kenneth Muir, "venerable and saintly" (xliv), it also does all it can to equivocate such virtues to make the King crafty, self-centered and tyrannical to his deserving subjects and thereby critiquing any simplistic notion of evil.

Macbeth is designed to confound dualistic categories, problematizing our moral perceptions and judgments and so, substantiating the weird sisters' contention that "Fair is foul, and foul is fair." And this it does by constantly equivocating the signified so as to escape any trap of complacent straitjacketing of meaning. For if Macbeth is a traitor, by the same parameters of treachery, Malcolm is treacherous as well. If Macbeth commits regicide, so does Malcolm. However, this is not the widely prevalent critical view of Malcolm which sees in him, as E. M. W. Tillyard opines in *Shakespeare's History Plays* (1944), Shakespeare's culminating version of the ideal ruler. Says Tillyard: "He is an entirely admirable and necessary type and he is what Shakespeare found that the truly virtuous king, on whom he had meditated so long, in the end turned into" (Tillyard 317). Like Wilson Knight and L. C. Knights, Tillyard affirms the importance, in *Macbeth*, of the theme of order disrupted then restored through Malcolm. But this is hardly a comprehensive reading of the text for Shakespeare, never letting the implications of equivocation slip, tells us that while Malcolm represents himself as one who "never was forsworn" (4.3.126,), who has barely "coveted what was mine own," (4.3.127) and who never falsely speaks, in gaining the Scottish throne, must nevertheless overthrow the fearful, usurping, but still-reigning king, Macbeth. True, Macbeth embodies the contemporary definition of a tyrant: he is usurping and self-interested, fulfilling James I's tutor, George Buchanan's claims that it is of the nature of tyrants that they seize office without being legally chosen, and rule autocratically. Further, Buchanan writes, tyrants have "power neither circumscribed by any bonds of the laws nor subject to any judicial investigation" (Buchanan 89). Applicable to Macbeth is also the definition of the tyrant as etched by the author of *Vindiciae Contra Tyrannos* (trans. 1588), attributed to Philippe Duplessis Mornay, whereby "rulers are called 'kings' when they promote the people's interest and are called 'tyrants,' as Aristotle says, when they seek only to promote their own." (Mornay 172). Yet, however strong the play's argument in favor of unseating Macbeth may be, it nonetheless challenges both legal statute and royal polemics among Shakespeare's contemporaries, which condemn king-killing even in the case of tyranny. English treason law, in the form of the 1534 Treason Act, regulated not only murder attempts against the

king, but also slanderous name calling, known as treason by words.

Such legislation regulates, then, precisely the type of words and act on tyranny and usurpation employed by Malcolm and his allies against Macbeth. In his *Six livres de la république* (1576), French political theorist Jean Bodin writes that it is illegal for "any subject individually, or all of them in general, to make an attempt on the honor or the life of the monarch, either by way of force or by way of law, even if he has committed all the misdeeds, impieties, and cruelties that one could mention" (Bodin 115). Here, obedience does not hinge on the ruler's merit, but instead on the subject's duty. The King and his supporters offered similar arguments against tyrannicide/regicide and James I himself goes on to write in *A Remonstrance for the Right of Kings* (1615), a text produced in the political controversy surrounding post-Gunpowder Plot legislation:

"I will not deny that an heretical Prince is a plague . . . but a breach made by one mischief must not be filled up with greater inconvenience: an error must not be shocked and shouldered with disloyalty, not heresie with perjurie, not impietie with sedition and armed rebellion against God and King" (James I 235).

A line of resistance theory was thus developed whereby unworthy kings, however tyrannical, ought to be regarded as a form of godly "plague" that people must endure before God offers deliverance. Subjects cannot take matters into their own hands, because this action would simply heap disease on disease, rather than offering a true remedy for the plague itself.

Judged against these parameters, Malcolm's triumph over the usurping Macbeth hardly remains as a cause for Stuart jubilation as it is often supposed to be. Since Macbeth is the reigning sovereign, his deposition, while arguably necessary, is nevertheless treasonous. Indeed, Macbeth and Malcolm both practice a form of adulterated sovereignty, coming to the throne employing underhand means rather than through simple succession. *Macbeth* thus shows how the evil of treachery/regicide that Macbeth has perpetrated against Duncan is counter-balanced by Malcolm's doing the same on him. And the play by refusing to take any side exclusively remains unique in its ambivalence, equivocating evil and thereby tantalizing us with its array of ever eluding significations.

Books Cited

Berger, Harry Jr. "The Early Scenes of Macbeth: Preface to a New Interpretation". *Making Trifles of Terrors: Redistributing Complicities in Shakespeare*. Ed. Peter Erikson. Stanford: Stanford University Press, 1997. Print.

Bodin, Jean. *On Sovereignty: Four Chapters from the Six Books of the Commonwealth*. Ed. and trans. Julian H. Franklin. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. Print.

Booth, Stephen. *Indefinition and Tragedy*. New Haven and London: Yale University Press, 1983. Print.

Bradley, A. C. *Shakespearean Tragedy*. London: Macmillan, 1957. Print.

Buchanan, George. *The Powers of the Crown in Scotland.* Trans. Charles Flynn Arrowood. Austin: University of Texas Press, 1949. Print.

Calderwood, James L. *If It Were Done: Macbeth and Tragic Action.* Amherst: University of Massachusetts Press, 1986. Print.

Carroll, William C, ed. *Macbeth*. Houndmills: Macmillan Press Ltd., 1999. Print.

Coleridge, Samuel Taylor. *Lectures and Notes on Shakespeare and Other Dramatists.* London: Oxford University Press, 1931. Print.

Desai, R.W. "Duncan's Duplicity". *William Shakespeare: An Anthology of Recent Criticism*. Ed. Leela Gandhi. New Delhi: Pencraft International, 1998. Print.

Dowden, Edward. *Shakespeare: A Critical Study of His Mind and Art.* London: Kegan Paul, 1918. Print.

Evans Malcolm. *Signifying Nothing: Truth's True Contents in Shakespeare's Texts.* London: Harvester Wheatsheaf, 1989. Print.

Hazlitt, William. *Characters of Shakespeare's Plays.* London: Oxford University Press, 1939. Print.

Holderness, Graham. "'Come in, equivocator': tragic ambivalence in Macbeth". *Critical Essays on Macbeth.* Eds. Linda Cookson and Bryan Loughrey. London: Longman, 1988. 61-70. Print.

James I. "A Remonstrance for the Right of Kings, and the Independence of their Crowns". *The Political Works of James I*. Ed. Charles Howard McIlwain. New York: Russell and Russell, 1965. Print.

Knight, K. Wilson. *The Wheel of Fire*. London: Methuen, 1960. Print.

Knights. L. C. *Explorations: Essays in Criticism Mainly on the Literature of the Seventeenth Century.* Harmondsworth: Penguin, 1964. Print.

Knights. L. C. *Some Shakespearean Themes*. London: Chatto and Windus, 1959. Print.

Mornay, Philippe Duplessis. "Vindiciae Contra Tyrannos*". Constitutionalism and Resistance in the Sixteenth Century: Three Treatises by Hotman, Beza and Mornay.* Trans. Julian H. Franklin. New York: Pegasus, 1969. Print.

Muir, Kenneth. Ed. *William Shakespeare*: *Macbeth*. Surrey: Thomas Nelson and Sons Ltd, 1997. Print.

Sanders, Wilbur. *The Dramatist and the Received Idea: Studies in the Plays of Marlowe and Shakespeare*. Cambridge: Cambridge University Press, 1968. Print.

Tillyard, E. M. W. *Shakespeare's History Plays*. London: Chatto and Windus, 1944.

Traversi, Derek. A. *Approach to Shakespeare*. New York: Anchor. 1956. Print.

Waith, M. Eugene. "Manhood and Valour in Two Shakespearean Tragedies". *ELH: A Journal of English Literary History*. Vol. 17, No. 4 (December 1950). Print.

(Footnotes)

1. **All quotations are taken from William C. Carroll edited *Macbeth.***

HUMAN RIGHTS AND STATE POLITICS IN INDIA—A CASE STUDY OF ASSAM

Koyel Basu
Assistant Professor
Department of Political Science
Email. - koyelbasu@hotmail.com

Human rights seem to refer to some inherent quality or value in human life which demands recognition, is backed by international agreements and defines a boundary in the treatment of our fellow human beings that should not be crossed. These are seen as those minimal rights which human beings are entitled to by virtue of being human beings, irrespective of any other consideration. These rights are expression of what is a life minimally worth living and are based upon primary material and immaterial necessities of life. Of course there cannot be single opinion about quality of life minimally worth living, about primary necessity of life and thus about human rights.

But still some rights must be regarded as fundamental like right to life with dignity, right to freedom of conscience and of course right to minimal means of subsistence. Martin Ennals observed, "The protection of human rights… is a worldwide responsibility which transcends all racial, ideological and geographical boundaries".[1] Human rights have been an essential ingredient of Indian culture and ethos. The situation of human rights in India is a complex one, as a result of the country's large size and tremendous diversity, its status as a developing country and its history as a former colonial territory.

A serious scrutiny of the Indian Constitution will show that this Constitution is replete with contradictions and inconsistencies. The architects of our Constitution were eager to give it a democratic countenance in preamble or in other chapters. At the same time they took measures to keep certain undemocratic articles within the Constitution. Therefore preserving the seamless web of India's spirit of democracy, unity and integrity and social revolution has been a daunting task.

In the Indian context, where life more than the law is the issue of struggle, explaining 'right' is not always best achieved. Eric Hobsbawm, the eminent historian of our times, observes, "India of course, remains . . . . By far the most impressive example of a Third World State that has . . . . . maintained unbroken civilian supremacy though whether this justifies the label, 'the world's greatest democracy' depends on how precisely we define Lincoln's 'government of the people, for the people, by the people."[2] No doubt, India

could maintain apparently uninterrupted civil governance among the Third World countries; however, whether the maintenance of civil governance could ensure a genuine democratic rule in India during the last sixty years is a pertinent question that can be raised. This brings us to the central paradox that this study wishes to address, i.e. a vibrant parliamentary democracy and a plural, heterogeneous society, seems capable consistent violation of human rights, particularly when it comes to political rights, such as the right to dissent. The stern iron fist under velvet glove of the Indian Constitution and other devices of the rulers take a repressive form and more often than not the state rescinds its civility and behaves with abject brutality.

Owing to the bewildering variety of its races and cultures, Assam has long been known as the symbol of India. Now that the fragility is being shattered by militant and ethnic stir and sub nationalist uprisings, she has also become a symbol of the crisis-ridden Indian polity. For these upsurges reflect not only a breakdown of the political process, but also a profound crisis in the economy and a radical confusion and uncertainty about the nature of the Indian state and its ideological foundations. Different sections feel that they have been left out in the cold by the process of development and have been prevented from having any say in the political decisions shaping their lives and therefore what is urgently required is a radical restructuring of the Indian state and its ideological foundations. Different sections feel that they have been prevented from having any say in the political decisions shaping their lives and therefore what is urgently required is a radical restructuring of the Indian state.

This is not to say that all these movements have an unadulterated democratic content. There are disturbing traces of chauvinism, aggressive intolerance and sectarian blindness in many of them.[3] Assam personifies an India which can quickly become illiberal—ethnic violence, politically targeted violence by militant groups, state violence, and even violent crimes with a political subtext can all go on with relative impunity. The voice of human rights activists had become faint in the din of national security talk. Yet pan-Indian ideas – laws, the Constitution and public discourse – have profoundly shaped the sub national movement in Assam.[4]

One needs to step back in time to trace the developments in the hill regions of Assam.Since 1947, the ethnic Assamese political leadership has pursued cultural policies that have sought to define Assam state as Assamese: for instance to make Assamese the official language of the state in 1960 and the language of instruction in the state's educational institutions in 1972[5].But before that already fissures appeared in the Assamese society.This has happened due to the interplay of multiplicity of factors of which continuous immigration from outside the region and a sense of economic depriva-

tion are the most important. Ever since the British occupation, there has been a continuous flow of non-Assamese Indians into Assam which gave rise eventually to the "Asom" movement."[6]

A serious movement for autonomy was thus taking shape in the state of Assam, 'more serious' because it was driven by a groundswell of grass-roots opinion rather than by individual charisma, and because this state is located not in the Indian heartland, but in its long-troubled extremities.[7] There were episodic riots in the 1950s and 1960s aimed at driving the immigrants back to where they came from.[8] There was a structural tension between the informal cultural grammar of the nation-province – which created the axiom of an Assamese Assam and Assam's demographic and ethno political reality. In most regions of India, the nation – province has been a success story. But Assam is a significant exception to this generalization.

In August 1979, on the advice of the outgoing Prime Minister, Charan Singh, the President of India dissolved the Lok Sabha and ordered fresh elections. Though the agitation started on a non-violent Gandhian note, with students participating in Ganasatyagrahas, eventually enormous amount of violence accompanied the movement. Assam was in a pool of blood. The following newspaper reports give a vivid reflection of a frightful period. For instance, *The Statesman* reported, "Police firing killed dozens and violent incidents took place in Upper Assam. Mr R Mitra, technical manager of Oil India, at Duliajan, was summoned by a false telephone call to come to the hospital to meet some injured persons. When his car reached the hospital gate, a violent mob smashed the car and stoned him to death."[9]

More violence in Assam followed shortly. According to a press report, "All the evidence suggests that the explosions that damaged the radio transmitters and the oil pipeline to Gauhati and Barauni was the handiwork of saboteurs, the last outrage setting a new record for destructive zeal. The unrest in Assam was not lacking in violence before. Apart from suspicion of coercion in obtaining support for continued boycotts, hunger strikes, and satyagrahas, the movement had taken toll of 246 lives—about 70 explosions—losses from suspended production of fertilizers and oil alone amounted to a colossal Rs 1100 crores."[10] Another incident of violence took place when the Upper Assam commissioner was killed. The Commission of Upper Assam Division, Mr. E S Parthasarathi was killed and the Indian Oil Corporation Gauhati-Siliguri product pipeline between Sarupeta and Barpeta was damaged in two bomb blasts.[11]

The years from 1979 to 1985 witnessed sustained political instability in the state. A report of an investigation committee of the Delhi-based Peoples Union for Civil Liberties gives a flavor of the early phase of the Assam movement. The Report chronicles how in

a satyagraha (symbolic disobedience of the law) in November 1979 nearly 700,000 people Were Killed in the city of Gauhati and an estimated two million people in the state as a whole courted arrest. "The Satyagraha" says the report "is fairly simple. People walk to the High Court in Gauhati or some such office in other towns, court arrest and are released a few hours later." The entire government machinery, said the report, was party to the Satyagraha. "The Government of Assam", a witness told the Committee, "is running the movement and the AASU is running the government."[12]

The entire state of Assam appeared to be in a state of seize. Breaking the chill of 18 months, negotiations were again resumed between the Assam agitators and the Central Government in June, 1984, the ice was broken by Union Cabinet Secretary C.R. Krishna swami Rao. The leaders came to Delhi for prolonged rounds of discussion. Indira Gandhi's handling of Assam problem was such that it followed a policy of long wait, indulged in guessing game and ignored all alarm signals. Rajiv Gandhi's untiring and sincere efforts to end the impasse through a political solution.[13] Was Laudable.

The Rajiv Gandhi government was able to sign an accord with the leaders of the movement on 15th August 1985. All those foreigners who had entered Assam between 1951 and 1961 were to be given full citizenship including the right to vote; those who had done after 1971 were to be deported; the entrants between 1961 and 1971 were to be denied voting rights for ten years but would enjoy all other rights of citizenship. A parallel package for the economic development of Assam, including a second oil refinery, a paper mill and an institute of technology, was also worked out. The central government also promised to provide 'legislative and administrative safeguards to protect the cultural, social and linguistic identity and heritage of the Assamese people.

The response to a rising level of political violence, President's Rule was imposed in Assam as already mentioned. The state was declared a "disturbed area" and responsibility for maintaining order was given to the army. The ULFA was banned and a major counter-insurgency offensive—"Operation Bajrang"—was launched. During this campaign, widespread human rights violations were reported. According to the Amnesty International Report: "Every single day reports pour in from different parts of the state about army atrocities, including killings, torture, rape and harassment…The local newspapers are full of heart-rending reports of ordinary people being picked up by the army for no reason, women being raped and houses raided at uncanny hours."[14]

Human Rights Abuses: Tryst with Horror

Despite attempts to rid Assam of insurgents by the state armed forces, many women and girls continued to be raped. On 6th October 1991, Raju Baruah, a girl from Sutaragaon,

was raped by four soldiers and her body thrown into a pond. Her sister identified the soldiers allegedly responsible and the report confirmed signs of rape. Her family was granted Rs 100,000 compensation but it is not known if the soldiers were brought to justice.[15]

Other victims have included people suspected of involvement in political campaigns for land reform, higher wages or autonomy for tribal regions. DhruvajyotiGogoi died in army custody in Assam in 1991. He was one of at least 12 people who died in custody in Assam during "Operation Bajrang." Reported to be an ULFA member, he was first arrested under the TADA in 1989 and released on bail. Sometime later the wife of a local superintendent of police was killed in an ambush on the road from Tinsukia to Dibrugarh. The police apparently suspected DhruvajyotiGogoi of involvement in the murder. On March 17, 1991 he was arrested by the army at Doomdooma, Tinsukia. A habeas corpus petition was filed at the Guwahati High Court to which the authorities were given a week to respond. But on the night of 19th March, the army handed over his dead body to the police. The army stated that the cause of death was epilepsy. However, a photograph of the dead man's body indicated that both his arms had been broken, that he had suffered stab wounds and injuries to his legs and face. The post-mortem reports conducted at the Assam Medical College Hospital, noted that he had a perforated liver and 28 injuries on his body. Despite these findings, strongly suggestive of torture no inquiry is known to have been held into the cause and circumstances of DhruvajyotiGogoi's death and no army personnel are known to have been arrested or prosecuted.[16]

Between November 28 and April 10, 1991, when the army suspended counter-insurgency operations, the army had reportedly arrested 1846 people in their search for the ULFA militants. A further 1000 were reportedly arrested by the police.[17] Many were detained at random during mass raids on their villages; others were arrested at the army check posts included peasants, labourers, academics, political and social activists, doctors and businessmen. Youths and students were a particular target. Many of those arrested are believed to have been tortured. In December 1990, the army denied allegations of torture and rape during "Operation Bajrang" and claimed they were fabricated by "political leaders with vested interests."

Over 100 habeas corpus petitions were filed in the Guwahati High Court between 27th November 1990 and March 1991 on behalf of people illegally detained and tortured during army operations in Assam. The High Court has upheld many petitions and ordered that the detainees be brought before it. However, the security forces have defied some High Court rulings. In January 1991, the Guwahati High Court acquitted student RajumoniBejbarooah and ordered that he not be taken into custody without the permis-

sion of the university hostel warden. RajumoniBezbarooah was detained again some two months later and reportedly severely tortured at an army camp at Golaghat. He alleged that soldiers had destroyed the court's order when he showed it to them.

Civil liberties organizations have played an important role in documenting human rights violations in Assam. In February 1991, team from the CPDR visited six districts in Assam. They gathered information on 49 cases of torture, 13 of rape, eight extra-judicial executions and one "disappearance." The Peoples' Union of Democratic Rights also published a report on Assam in May 1991. It concluded that most of the persons detained by the army were tortured. Some forms of torture that were used were beating, stripping and hanging victims upside down and then beating on head and chest, thumping on chests with boots, pouring ice cold water, burying them up to chest and then beating or keeping a bucket over the head, squeezing testicles with clamps, dipping in cold water drums, forcefully keeping them awake for days together, denial of food or water are some of the forms of torture used. But the most common form is electric shocks. Sensitive parts of the body including ears, tongue, armpits, genitals and head were repeatedly given electric shocks sometimes in progressively higher voltages. With electrodes at each temple the brain was subjected to electric waves.[18]

In March 1992, New York based *Human Rights Watch* sent an investigator to Assam. The investigator was "harassed, questioned and followed by police" all through her travels in Assam. Despite that, she managed to visit some of the worst affected areas of Assam, where she interviewed families of victims of the Indian army's abuses. She found confirmation of reports of a pattern of human rights abuses by security personnel and of acts of violence committed by members of ULFA. The following is an excerpt from the Asia Watch report:

"The Indian army has conducted massive search-and-arrest operations in thousands of villages in Assam. Many victims of abuses committed during these operations are civilians, often relatives or neighbours of young men suspected of militant sympathies. Villagers have been threatened, harassed, raped, assaulted and killed by soldiers attempting to frighten them into identifying suspected militants. Arbitrary arrest and lengthy detention of young men picked up in these periodic sweeps, or at random from their homes and from public places are common, and detainees of the armed forces are regularly subjected to severe beatings and torture. Deaths in custody have occurred as the result of torture, and in alleged encounters and escape attempts."[19] The report also notes that dissent in Assam was severely curtailed, that human rights activists and journalists were arrested for reporting on human rights abuses, and that militant groups were responsible for human rights abuses through

acts of violence including bombings, kidnappings, and assassinations, targeting dissident ULFA members and suspected informers.[20]

A more recent report, *Where 'Peacekeepers' Have Declared War*, by a fourteen-member fact-finding mission of, journalists, and human rights activists from various parts of India, was published in April 1997. The team visited all seven northeastern states in April 1996 to examine the impact of the frequent use of the Armed Forces Special Powers Act of 1972 (AFSPA) on the region. The mission found "that despite denials to the contrary, the security forces have, over the last four decades, blatantly violated all norms of decency and the democratic rights of the common people of the region."[21] In the case of Assam, the report lists abuses by the army in the course of dealing with ULFA and the Bodo insurgents as well as the campaign for Karbi autonomy. It was not just the Indian army, "at times as many as six different military and paramilitary forces—the Assam police, Assam Rifles, Border Security Force, Army, Punjab Commandos and Black Panthers—were operating in Assam.[22]

The Latest Spate of Ethnic Violence in Assam

In the recent spate of violence that hit Assam on July 6 and Jul 19, 2012, four persons from the minority community were killed while on July 20, 2012, four ex-Boro Liberation Tigers cadres were shot dead. The situation turned worse in Kokrajhar, Baska and Chirag regions. The Assam Chief Minister, TarunGogoi who was holding the home portfolio, was criticized for not taking matter seriously and deploying adequate forces to man the disturbed areas.Meanwhile, the crisis went on snowballing and finally exploded in the form of a communal riot, throwing every aspect of public life out of gear. The Chief Minister confirmed that 50,000 people found shelter in relief camps. The government, while trying to bring the riot under control, looked to be in no position to set time frames to effect any change for the better. The Ministry of Home Affairs, as per the Assam government's plea, deployed more troops to the violence-hit areas.[23]

Maoists have also entered into the fray. They attempted tapping ethnic discontent to make inroads into an already volatile region. Tehelka magazine has accessed a recent intelligence report sent to the Union home ministry that points out that the Maoists have come into an "understanding" with ULFA commander-in-chief, PareshBarua and that the ULFA has provided the Maoists with Chinese grenades and firearms. The report also says that Naga insurgents are training a group of new Maoist recruits in Myanmar. Add to these the fact that the Maoists in Assam have brought former ULFA sympathizers and cadres into their fold, and one could be staring at a long, bitter battle in the Northeast

with strong ethnic dimensions.[24]Assam has witnessed more tribal violence in recent years. Clashes between two tribes in northern Assam in early January 2014 left 16 people dead and forced thousands of others to flee their homes. More than 3000 people from the Karbi and Rengma Naga tribes evacuated their homes and took shelter in relief camps. The state's ethnic violence comes from overlapping claims for territory between rival tribal groups. The then Assam Home Secretary Gyanendra Dev Tripathi conceded, "The exodus began after the attacks last month and over 3,500 people from both communities have taken shelter in nine relief camps opened by the government."[25] 2013 also witnessed the arrest of 341 militants, in addition to 534 militants arrested in 2012 and 407 in 2011. Sustained pressure on the various rebel formations had resulted in the surrender of another 2055 militants during 2013. Summing up the situation, Chief Minister TarunGogoi, while speaking at the Chief Ministers' conference at New Delhi on April 15, 2013 observed, "In the past few years, there has been a declining trend of militant violence and talks are on with several militant outfits. However, it would be overoptimistic to declare that the nightmare of militant violence is over."[26] The Union Ministry of Home Affairs, while extending the term of the 'disturbed area' tag for the State for another year from December 4, 2013, stated, on November 23, that the "law and order situation' in the state continued to be a matter of concern".[27]

Conclusion:

Regions of armed conflict have a heavy presence of security forces as well as armed non-state actors and consequently are marked by militarization. Human rights violations take place in areas of insecurity and militarization. According to recent reports from Assam, though violent actions by armed groups declined in 2003-2004, the number of killings went up in the same period.[28] In fact deaths of civilians, insurgents as well as security forces increased from 1994. From 1994 till 2010, 8660 civilians died in the North-East. Many individuals 'disappeared' from the custody of the security forces in the 1990s. Such unlawful termination of individuals (no matter whether they were involved in unlawful activities or not) has been seen as deliberate terror tactics by the state.[29]The Assam State Human Rights Commission has received 6,500 complaints from 1993 to 2008, many of which are still pending.[30]

There has been much concern about police and army officials who have been killed or injured when carrying out state duties in insurgent crossfire. Violence and human rights violation are not monopolies of the state. The state has its own justifications for carrying out certain actions. The state views national security as its primary concern that forms the basis of their internal security and foreign policy. Armed struggles are consid-

ered an assault on the state. The modern state is a Weberian construct, claiming legitimate right to violence and force to maintain its rule based on the consent of its citizens. As Walter Benjamin pointed out, "Law making is power making and to that extent, an immediate manifestation of violence."[31] Personnel of the state in conflict zones have elements of risks built into the service or occupational hazards. When state servants are killed state honours them as martyrs. However, this is not enough to keep their morale high. Senior army officers are distressed by the repeated use of the Army in counter-insurgency operations (nearly 200,000 security forces personnel, including local police are presently deployed in the north-eastern states "in aid of the civil society") because of the natural reluctance of the soldiers to use force against their own people which soldiers plainly perceive is the result of the failures of the politicians.[32] In the words of the eminent Assamese intellectual, Prof. Hiren Gohain, "The Army's morale was eroded gradually under the temptation and stresses of this unsavory business. And if it has ferreted out a number of 'terrorists' it has also profoundly antagonized the rural population with its drastic disregard for civil rights."[33]

The ULFA, which has projected itself as the self-styled custodian of the Assamese interests, arrogated to itself the power of determining the culture of the community. It not only contributed to an escalation of violence in society but also wiped out the other possible alternatives and disciplines, the other possible cultural forms, with a single, pre-defined type. ULFA's complain that 'the agony of Assam' is proportional to the prosperity of New Delhi did win support of the masses for a while. However, as they became instruments of mindless violence and ruthless extortionists, their legitimacy was lost.[34]

It now appears that ULFA and the Government has been sending signals at cross purposes. While for ULFA as well as the Citizens' Forum, the real challenge was to arrive at a settlement – more than simple cessation of hostilities or what in strategic circles is known as 'suspension of operations', the Government thought in terms of getting 'the majority of ULFA leaders' to first 'surrender', agree to come forward and sit around the negotiating table. BertilLintner wrote after his visit to the Northeast: "The word here in Guwahati is that New Delhi may try to neutralize ULFA with money and promises of representation in local administrations – as it has done with other separatist movements in India's north-eastern region."[35]

The insurgency has exhausted the Assamese people and left them yearning for peace. More than anything else, they want to get on with their lives with dignity and in peace. The tragedy of Assam is that the entire edifice of civil society institutions has crumbled as well.The greatest challenge for the national leadership is to overcome the alienation of the Assamese people. The atmosphere has been vitiated with distrust and recruit-

ment and the philosophy of hate disseminated by the advocates of violence. Peace and confidence building measures can be most effective if they involve the participation of popular mass leaders and people of known integrity and credibility, who enjoy the confidence of the Assamese people.

If the hallmark of a democratic political system is to manage and negotiate differences peacefully, Assam is a paradoxical case. It has practiced democracy like most states of India, and yet, it has witnessed a consistent politics of violence alongside it. The case of Assam is complicated by the demographic heterogeneity of the state, with the ethnic Assamese of the plains seldom feeling democratically empowered amid a wide mélange of ethnic communities and tribes that have from time to time resisted the attempt to impose the dominance of the former. The large presence of Bengalis, together with their relatively easy socialization into the native language, has culturally threatened the Assamese and made them insecure in the face of continuous Bengali immigration across the international border with Bangladesh. The larger tribal groups, the Bodos in particular, have similarly felt culturally, economically and politically marginalized and often engaged in violence against other groups. The rise and weakening of the militant ULFA, and the subsequent securitization of the threat by the Indian state, has been largely responsible for the enormous crisis of human rights in Assam over three decades.

This chapter thus reveals that there is little guarantee that normal institutions and practices of democracy will ipso facto secure human rights. The politics of numerical majoritarianism and the increasingly territorialized notions of power and governance eat into the vitals of a democratic process and paralyze it before draconian strategies of dominance and denial of the other, either by the militant groups or by the state. The conventional finding that civil societal groups target the violence of the state and neglects the criminality of groups as against the opposite portrayal by the apologists of the state and security experts is also validated in the case of Assam. For this study, the most critical aspect remains the inefficacy of democratic institutions and practices to protect the rights of individuals and groups and create a credible buffer against large-scale violence.

BIBLIOGRAPHY:

PRIMARY REFERENCES

1. 'Assam and the crisis of Indian democracy', *The Telegraph*, 7th February 1991

2. 'Editorial', *Assam Tribune*, May 27, 1949

3. Census of India 1991

4. ***BleedingAssam: The Role of the ULFA*. Ministry of Home Affairs, Government of India.**

5. ***Assam Tribune*, June 10, 1987**

6. ***Amnesty International Report*, New Delhi: Vistaar Publications, 1993, p. 39**

7. **No End in Sight: Human Rights Violations in Assam", *Asia Watch*, Vol. 5, No 7, 1993, p.1**

8. **Where "Peacekeepers" Have Declared War: Report on Violations of Democratic Rights by Security Forces and the Impact of the Armed Forces (Special Powers) Act on Civilian Life in the Seven States of the North-east', published by National Campaign Committee Against Militarization and Repeal of Armed Forces (Special Powers) Act,1997.**

9. **The ULFA ups the ante', *The Hindu*, 6th February, 2000**

SECONDARY REFERENCES—

A. BOOKS AND BOOK ARTICLES-

1. M Crawford Young, *The Politics of Cultural Pluralism*, University of Wisconsin Press, Madison, 1976, p. 72

2. SanjibBaruah, 'Politics of sub nationalism: Society versus State in Assam' in Partha Chatterjee (ed). *State and politics in India*, New Delhi :Oxford University Press, 1998, p-498.

3. Abu Nasar Saied Ahmed, JoydeepBaruah and RatnaBhuyan (ed.) *Election Politics in Assam: Issues, trends and People's mandate*, New Delhi, Akansha Publishing House, 2006, p. -105

4. Vibhuti Singh Shekhawat, *Assam: From Accord to ULFA*, New Delhi: Anamika Publishers, 2007, p. 21.

5. Ajay Singh, 'Peace Sans Democracy: A Study of Ethnic Peace Accords in India's North East' in SanjibBaruah (ed.), *Beyond Counter-Insurgency: Breaking the Impasse in Northeast India*, Delhi : Oxford University Press, 2009, pp. 246-247

B. JOURNAL ARTICLES:

6. Samir Kumar Das, Conflict and Peace in India's North-East: The Role of Civil Society, Washington, DC: East-West Center, *Policy Studies*, No 42, 2007, p. 10

7. **Shailesh K Singh's 'Background to the Insurgencies: A Brief Outline of Some Notable Periods in Assam's History,' *Peace Initiatives*, Vol. IV, No. 1 and 2, pp 6-7**
8. **Hiren Gohain, 'Ethnic Unrest in the North-East', New Delhi :*Peace Initiatives*, January–April 1998, Vol.-IV, Nos. I & II, pp. 66-67.**
9. **PranNathLuthra, 'The North-East on a Razor's Edge', *Peace Initiatives*, New Delhi, January 1998, Vol. IV, No. I&II, p. 27**
10. **DilipGogoi, 'Quest for SwadhinAsom: Explaining Insurgency and Role of the State in Assam'. in Sudhir Kumar Singh and DipankarSengupted*'Insurgency in North-East: The role of Bangladesh'*, New Delhi : Authors Press, 2013, p. 43**
11. **Karan R Sawhny, 'Insurgency and Counter-Insurgency', *Peace Initiatives*, New Delhi, Vol. IV, No I and II, Jan-April 1998, p. 86**
12. **JaideepSaikia, 'Revolutionaries or Warlords-ULFA's Organizational Profile', *Faultlines*, New Delhi, July 2001, p.119**
13. **SanjibBaruah, 'Immigration, Ethnic Conflict and Political turmoil—Assam, 1979-1985', *Asian Survey*, Vol. 26, No 11, 1986, p. 1194.**
14. **Monirul Hussain, 'Ethnicity, Communalism and State: Barpeta Massacre', *Economic and Political Weekly*, Vol. 30, No. 20, May 20, 1995, p. 1154**
15. **SanjibBaruah, "The State and Separatist Militancy in Assam: Winning a Battle and Losing a War?", Berkeley: *Asian Survey*, Vol. 34, No. 10, October 1994, p. 876**
16. **JaideepSaikia, *Contours*, Guwahati, 2001, p. 19**
17. **Dinesh Kotwal, 'The contours of an insurgency', Strategic Analysis, Vol. 24, No.12, March 2001, p. 2224**
18. **SanjibBaruah, 'Separatist Militants and Contentious Politics in Assam, India: The Limits of Counterinsurgency', *Asian Survey*, Vol. 29, No 6, November-December 2009, p. 974**
19. **BertilLintner, 'ULFA: Rudderless Rebellions' in Look East, May, 2010, p. 21**
20. **Virginia Van Dyke, 'The Khalistan Movement in Punjab: India and the Post-Militancy Era Structural Change and New Political compulsions', *Asian Survey*, Vol. 49, No. 6, November/December 2009, p. 997.**

ELECTRONIC REFERENCES:

1. **Human Rights Watch and Ensaaf report titled 'Protecting the Killers: A Policy of**

Impunity in Punjab, India, Vol. 19, No 14(c), October 2007, p.16 . Source: www.hrw.org/sites/default/files/reports/india1007webwcover.pdf

2. **Report by Delhi-based Peoples' Union for Democratic Rights titled "Restless Frontier: Army, Assam and its People", Delhi,: PUDR, May 1991. Source: http://www.pudr.org/?q=content/restless-frontier-army-assam-and-its-people**
3. **Samir Kumar Das, Assam: Insurgency and the Disintegration of Civil Society. Source:http://www.satp.org/satporgtp/publication/faultlines/volume13/Article5.htm**
4. **Bleeding Assam: The Role of ULFA", *Strategic Digest*, New Delhi: Institute of Defense and Strategic Analysis, April 2000, p. 199. Cf.http://www.idsa-india.org/an-mar-6.01.html**
5. **Samir Kumar Das, ULFA, Indo-Bangladesh Relations and Beyond, p. 2. Source: http://internalconflict.csa-chennai.org/2010/10/ulfa-indo-bangladesh-relations-and.html.**
6. **AjaiSahni and Bibhu Prasad Routray, 'Sulfa – Terror by another Name', *Faultlines*, Vol. 9, http://www.satp.org/satporgtp/publication/faultlines/volume9/Article1.htm**
7. **Ratnadip Choudhury, 'How ULFA's strongholds are falling to the reds', Tehelka Magazine, Vol. 10, Issue 30, 27 July 2013. Websource:http://www.tehelka.com/how-ulfa-strongholds-are-falling-to-the-reds/-**
8. **http://www.eurasiareview.com/14012014-india-assam-assessment-2014-analysis/**
9. **Shubham Ghosh, 'Roots of Assam violence are too deep for easy solutions.' Source: http://news.oneindia.in/feature/2012/assam-riots-roots-too-deep-for-indian-state-1-1041175.html**
10. **'Thousands flee tribal violence in India's Assam'. Source: http//www.presstv.in/detail/2013/01/08/344400/thousand-the-tribal-violence-in-india/march222014**
11. **ManabAdhikarSangramSamiti, Where All They Have Gone?—A Report of Some of Disappearance Cases in Assam,August 1998 Source: http://www.assam.org/node/2382**

(Footnotes)

1. Siddhartha Guha Roy, *Human Rights, Democratic Rights and Popular Protest*, Calcutta, Progressive Publishers, 2001, p.16
2. Siddhartha Guha Roy, "Civil Rights in India : Towards Framing a Contemporary History" in

SubrataSankarBagchi (ed.), Expanding Horizons of Human Rights, Atlantic Publishers and Distributors, New Delhi, 2005, p. 62.

3. 'Assam and the crisis of Indian democracy', *The Telegraph*, 7th February 1991
4. SanjibBaruah, *India against itself – Assam and the Politics of Nationality*, New Delhi: Oxford University Press, 1999, pp. xiv-xv.
5. Samir Kumar Das, Conflict and Peace in India's North-East: The Role of Civil Society, Washington, DC: East-West Center, *Policy Studies*, No 42, 2007, p. 10
6. Shailesh K Singh's 'Background to the Insurgencies: A Brief Outline of Some Notable Periods in Assam's History,' *Peace Initiatives*, Vol. IV, No. 1 and 2, pp .6-7
7. Ram Chandra Guha, *India after Gandhi – The History of the World's Largest Democracy*, London : Picador India, 2007, p. 554
8. Ibid.
9. 'Ten feared killed in Assam-Army called out in Duliajan', *The Statesman*, 19th January, 1981.
10. *The Statesman*, 14th February 1980.
11. *The Hindu*, 7th April 1981.
12. SanjibBaruah, 'Immigration, Ethnic Conflict and Political turmoil—Assam, 1979-1985', *Asian Survey*, Vol. 26, No 11, 1986, p. 1194. An account of the Report is available as "Magnitude of Assam Disorder: Report of PUCL Team", New Delhi :*Mainstream,* March 8, 1980, pp 18-21.
13. Vibhuti Singh Shekhwat, *Assam: From Accord to ULFA*, New Delhi :Anamika Publishers, 2007, p. 175.
14. Ibid, p. 24
15. Ibid., pp. 24-25
16. Ibid., pp. 48-49
17. Ibid., p. 25
18. Report by Delhi-based Peoples' Union for Democratic Rights titled "Restless Frontier: Army, Assam and its People", Delhi,: PUDR**,** May 1991. Source: http://www.pudr.org/?q=content/restless-frontier-army-assam-and-its-people
19. "No End in Sight: Human Rights Violations in Assam", *Asia Watch*, Vol. 5, No 7, 1993, p.1
20. Ibid.
21. 'Where "Peacekeepers" Have Declared War: Report on Violations of Democratic Rights by Security Forces and the Impact of the Armed Forces (Special Powers) Act on Civilian Life in the Seven States of the North-east', published by National Campaign Committee Against Militarization and Repeal of Armed Forces (Special Powers) Act,1997.
22. Ibid.**,** p. 53
23. Shubham Ghosh, 'Roots of Assam violence are too deep for easy solutions.' Source: http://

news.oneindia.in/feature/2012/assam-riots-roots-too-deep-for-indian-state-1-1041175.html

24. Ratnadip Chowdhury, 'How ULFA's strongholds are falling to the reds', Tehelka Magazine, Vol. 10, Issue 30, 27 July 2013. Websource:http://www.tehelka.com/how-ulfa-strongholds-are-falling-to-the-reds/-

25. 'Thousands flee tribal violence in India's Assam'. Source: http//www.presstv.in/detail/2013/01/08/344400/thousand-the-tribal-violence-in-india/march222014
26. Source: http://www.eurasiareview.com/14012014-india-assam-assessment-2014-analysis/
27. Ibid
28. Anuradha M Chenoy and Kamal A MitraChenoy, *Maoist and Other Armed Conflicts*, New Delhi : Penguin Books, 2010, p1431.
29. ManabAdhikarSangramSamiti, Where All They Have Gone?—A Report of Some of Disappearance Cases in Assam,August 1998). Source: http://www.assam.org/node/2382
30. Anuradha M Chenoy and Kamal A MitraChenoy, *n.28*, p. 146
31. Walter Benjamin, 'Critique of Violence', in P. Demtz, (ed.), *Reflections, Essays, Aphorisms*, Autobiographical Writings, Berlin : Schocken, 1986, p. 295
32. Karan R Sawhny, 'Insurgency and Counter-Insurgency', *Peace Initiatives*, New Delhi, Vol. IV, No I and II, Jan-April 1998, p 90
33. Ibid
34. Samir Kumar Das, ULFA- A Political Analysis, Delhi:Ajanta publications,p.34
35. BertilLintner, 'ULFA: Rudderless Rebellions' in Look East, May, 2010, p. 21. Cited in Samir Kumar DasULFA, Indo-Bangladesh Relations and Beyond, p. 2. Source: http://internalconflict.csa-chennai.org/2010/10/ulfa-indo-bangladesh-relations-and.html.

প্রাণের প্রাণ হনন

সাহাবুল সেখ
ভূগোল অনার্স, পঞ্চম সেমিস্টার

ভূমিকা :

আমাদের সৌরজগতের মধ্যে পৃথিবী একমাত্র গ্রহ যেখানে প্রাণ ও প্রাণীর অস্তিত্ব রয়েছে। এই প্রাণ ও প্রাণীর অস্তিত্বের কারণ উদ্ভিদের অস্তিত্ব। এই উদ্ভিদের অস্তিত্বের জন্যেই মৃত গ্রহটি জীবিত। এই সবুজ উদ্ভিদের দ্বারা সজীব রয়েছে পৃথিবী। এই উদ্ভিদের দ্বারাই প্রাণ পেয়েছে প্রাণী। এই উদ্ভিদের দ্বারাই পৃথিবীতে প্রাণের স্পন্দন স্পন্দিত হয়। এক কথায় এই উদ্ভিদই হল প্রাণীর প্রাণ। স্রষ্টা প্রাণীর সৃষ্টির আগে উদ্ভিদকে সৃষ্টি করে প্রাণী সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলেছে। তারপর প্রাণীর সৃষ্টি করেছেন। এই উদ্ভিদ না থাকলে থাকত না জীবনের জীবন সুর, থাকত না প্রাণীর প্রাণ, স্পন্দিত হত না প্রাণের স্পন্দন, হয়তো রচিত হত না পৃথিবীর ইতিহাস। মানুষ আবির্ভাবের সময় থেকে গাছগুলোই ছিল তাদের প্রথম ও পরম বন্ধু। এই উদ্ভিদের জন্য আজ আমরা বেঁচে আছি। এই উদ্ভিদের অস্তিত্বের জন্যই আজ আমাদের অস্তিত্ব। এই উদ্ভিদই উৎপাদকের ভূমিকা পালন করে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া খাদ্য প্রস্তুত করে, যা খেয়ে সমস্ত প্রাণী বেঁচে থাকে। শুধু তাই নয়, শ্বসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে ক্ষতিকারক CO_2 গ্যাসটি উৎপন্ন হয়, সেটি এই উদ্ভিদই অমৃত ভেবে পান করে নেই এবং তার বিনিময়ে উপহার স্বরূপ বিশুদ্ধ অক্সিজেন দেয়। যেটি প্রাণীরা প্রশ্বাসের মাধ্যমে গ্রহণ করে যেটি ছাড়া কোনো প্রাণী একমুহূর্তে বাঁচতে পারে না। এইভাবে উদ্ভিদ পরিবেশে O_2 ও CO_2-এর ভারসাম্য রক্ষা করে। একদিকে উদ্ভিদ যেমন পরিবেশে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করে, তেমনি অন্যদিকে খাদ্য O_2-এর জোগান দিয়ে মানুষসহ সকল প্রাণীকে বাঁচিয়ে রাখে তাই বলা যায় —

‘‘গাছই মোদের বন্ধু, গাছই মোদের প্রাণ
গাছই মোদের মান, গাছই মোদের ত্রাণ,’’

বনবিনাশ :

আজ গোটা বিশ্ব জুড়ে নির্বিচারে চলছে (উদ্ভিদকে) বিনাশ করার কর্মকান্ড। আধুনিক বিশ্বে বিজ্ঞানের অপরিকল্পিত রূপায়নের ফলে একদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নগরায়ণ ও শিল্পায়নের বিকাশ যেমন হচ্ছে অন্যদিকে চলছে নির্বিচারে বৃক্ষচ্ছেদন। মানুষ তার জীবনে জীবিকার তাগিদে সুখ ও সাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির প্রয়োজনে এই ধরনের আনাড়ি হস্তক্ষেপ করে চলেছে। যার ফলে পৃথিবীটা স্বাভাবিক জীবনধারণের উপযোগিতা হারাচ্ছে। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে যে হারে বনভূমি অবলুপ্ত হচ্ছে তা ভাবলে অবাক হতে হয়। যেখানে ১৯০০ সালে বিশ্ব স্থল ভাগের ৫০ শতাংশ স্থান জুড়ে বনভূমি সেখানে বর্তমানে স্থলভাগের ২০ শতাংশ স্থানে বনভূমি রয়েছে। বিগত ১০০ বছরে ৩০ শতাংশ বনভূমি ধ্বংস হয়ে গেছে। বর্তমানে ক্রান্তিয় অঞ্চলে ৭০ লক্ষ বর্গ কিমি স্থান জুড়ে রয়েছে চিরহরিৎ অরণ্য। প্রতিবছর এই বনভূমির ১ লক্ষ বর্গকিমি স্থানের গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে। ১৯৫০ সালে ক্রান্তিয় বনভূমির পরিমাণ ছিল ২৫ শতাংশ আজ তা মাত্র ৭ শতাংশে এসে ঠেকেছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে FAO অনুমান করেছে যে এইভাবে বৃক্ষচ্ছেদন হতে

থাকলে আগামী ৫০ বছর পর পৃথিবীতে বনভূমি বলে কিছুই থাকবে না।

ভারতের ক্ষেত্রে অরণ্যছেদন অত্যন্ত ভয়ানক। ভারত ভৌগলিক আয়তনের ৪০ শতাংশ স্থান জুড়ে অরণ্য ছিল। ২০০৩ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী কমে হয়েছে ২০ শতাংশ। আবার ১৯৯৬-১৯৯৮ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে IRS-IB, IC ও ID উপগ্রহগুলির মাধ্যমে সংগৃহিত চিত্র সমূহের বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভারতের অরণ্যাচ্ছাদন সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য পাওয়া গেছে। Forest survey of India-১৯৯৯ কর্তৃক প্রকাশিত ঐ তথ্য অনুসারে ভারতে অরণ্য দ্বারা অধিকৃত ক্ষেত্রের আয়তন ৬,৩৭,২৯৩ বর্গকিমি যা ভারতের মোট আয়তনের প্রায় ১৯.৩৯ শতাংশ। যেখানে পৃথিবীকে মাথাপিছু অরণ্য ভূমির পরিমাণ গড়ে ১ হেক্টর, সেখানে ভারতের ক্ষেত্রে এর পরিমাণ মাত্র ০.১০ হেক্টর। ভারতে প্রতিবছর ১.৫ লক্ষ হেক্টর অরণ্যাচ্ছাদন বিনিষ্ট হচ্ছে। এর ফলে মোট ভূ-ভাগের ১ শতাংশ ভূমি প্রতিবছর বন্ধ্যা ভূমিতে পরিণত হচ্ছে। ১৯৮৯ সালের পরিসংখ্যানের একটি তথ্য অবাক করে তোলে। এই তথ্যটি হল ভারতে প্রায় ১৫ কোটি ৭০ লক্ষ টন কাঠ শুধু জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়, যা প্রায় ২৩ কোটি ৫০ লক্ষ ঘনমিটার কাঠের সমান। এই হার অব্যাহত থাকলে আগামী ২০ বছরের মধ্যে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ অরণ্য বিহীন হয়ে পড়বে।

বৃক্ষছেদনের ফলাফল :

এই উদ্ভিদই প্রাণীর প্রাণ, এই উদ্ভিদই প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার প্রধান উপাদান। এই উদ্ভিদই ভূ-পৃষ্ঠের প্রাকৃতিক ছাতা। এই উদ্ভিদের অস্তিত্ব বিপন্ন মানে প্রাণ ও প্রকৃতির অস্তিত্ব বিপন্ন, ব্যাপারটা কান টানলে মাথা আসার মতোই। তবু মানুষ আজ নিজের পায়ে নিজেই কুঠার মারার মতোই নিজেই তথা এই উদ্ভিদের ধ্বংসলীলায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। এই উদ্ভিদের ধ্বংস বা বৃক্ষ ছেদনের কুপ্রভাব সম্পর্কে সংক্ষেপে নিম্নে আলোচনা করা হল —

১। ভূমিক্ষয়, নদীর গভীরতা হ্রাস ও বন্যা :

বৃক্ষাদি মৃত্তিকাচূর্ণকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরে রাখে এবং ভূমিভাগের উপর ছাতার ন্যায় মৃত্তিকাকে সংরক্ষণ করে। ফলে বৃষ্টি ধারার হাত থেকে ভূমিকে রক্ষা করে। বৃক্ষছেদনের ফলে মৃত্তিকা কণাসমূহ আলগা হয়ে পড়ে এবং ভূমিক্ষয় ঘটে। ভূমিক্ষয়ের ফলে পলি সঞ্চিত হয়ে নদীগর্ভ ভরাট হয়ে আসে। ফলে একটানা প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হলে বন্যা দেখা দেয়।

২। বাস্তুতান্ত্রিক সম্পর্ক নষ্ট :

উদ্ভিদ বাস্তুতন্ত্রের প্রধান সজীব উপাদান। উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় খাদ্যপ্রস্তুত করে উৎপাদকের ভূমিকা পালন করে ট্রপিক স্তরের সর্বনিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তরের প্রাণীদের প্রাণধারণের ভিত্তি গড়ে তোলে। এছাড়াও উদ্ভিদকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে একাধিক বাস্তুতন্ত্র। সেই সমস্ত বাস্তুতন্ত্র নষ্ট হয়। অর্থাৎ উদ্ভিদের ছেদনের ফলে বাস্তুতান্ত্রিক সম্পর্ক নষ্ট হয়।

৩। O_2-এর ঘটিত, CO_2-এর ক্রমবর্ধমান ও বিশ্ব উষ্ণায়ন :

শিল্প বিপ্লবের পর থেকে যে হারে বৃক্ষছেদন হচ্ছে তার ফলে একদিকে বাতাসে O_2-এর পরিমাণ কমে যাচ্ছে। অন্যদিকে CO_2-এর পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। ফলে O_2 ও CO_2- এর মধ্যে ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। যেখানে শিল্পবিপ্লবের ৭০০ বছর আগে বায়ুতে CO_2-এর পরিমাণ ছিল ২৮০ P.P.M. 2005 সালে তা দাঁড়িয়েছে 379 P.P.M (Part per Million)। বিগত ১৯৯৫-২০০৫ সালের মধ্যে তা প্রতিবছর CO_2.-এর পরিমাণ ১.৯ হারে বেড়ে চলেছে। বিজ্ঞানীদের

অনুমান, ২০৫০ সালে CO_2.-এর পরিমাণ হবে ৪৫০PPM এবং ১৪০ বছর পরে এই গ্যাসটির পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে যাবে। বিশ্ব উষ্ণায়নে এই গ্যাসটির প্রভাব সবচেয়ে বেশি ৫০-৬০ শতাংশ। এইভাবে গ্রিনহাউস গ্যাসের ক্রমবর্ধমানতার কারণে পৃথিবীর গড় উষ্ণতা 1^0C বৃদ্ধি পেয়েছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা ২০৩০ সালে পৃথিবীর গড় উষ্ণতা বাড়ার হার হবে 2^0C। এইভাবে বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে সুমেরু ও কুমেরু অঞ্চলে সঞ্চিত বরফরাশি গলে যাচ্ছে। ফলে সমুদ্রতলের উচ্চতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদি সমুদ্র তলের উচ্চতা ১ মিটার বাড়ে তবে বিশ্বের প্রায় ৫০ কোটি মানুষ চরম ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়বে এবং ভারত, বাংলাদেশ, মালদ্বীপ, মিশর সহ প্রভৃতি দ্বীপ জলের তলায় তলিয়ে যাবে।.

৪। মরুভূমির প্রসার ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হ্রাস :

বনভূমি মরুভূমির প্রসারকে বাধা দেয়। তাই এর ধ্বংস মরুভূমির ঘটায় একই সঙ্গে বৃষ্টিপাতের পরিমাণও হ্রাস পায়।

৫। মাটির উর্বরতা ও কৃষি উৎপাদন হ্রাস :

অরণ্য ধ্বংসের ফলে মাটিতে জৈব অবশেষ সঞ্চিত হয় না। ফলে হিউমাস তৈরি না হওয়ায় মাটি অনুর্বর হয়ে পড়ে। এছাড়াও মৃত্তিকার উপরিস্তর ক্ষয় পাওয়ার কারণে মাটির উর্বরতা শক্তি কমে যায়। এর ফলে কৃষি উৎপাদন হ্রাস পায়।

৬। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি :

বনভূমি বৃক্ষহীন হয়ে পড়লে খরা-বন্যা, ভূমিকম্প, ঝড়-ঝঞ্ঝা, সামুদ্রিক জলচ্ছ্বাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরিমাণ বেড়ে যায়।

৭। পশুপাখি ও প্রাণীর প্রাণ বিপন্ন :

বনভূমি হল পশু-পাখির আশ্রয়স্থল। এই বনভূমিকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকে নানা ধরণের প্রাণী। বনভূমি ধ্বংসের ফলে পশু-পাখি ও প্রাণীদের প্রাণ বিপন্ন হয়ে পড়ে। উইলসন (১৯৯৮ সালে) এর সমীক্ষা অনুসারে, ক্রান্তিয় বৃষ্টি অরণ্যে যে হারে বনবিনাশ হচ্ছে তার ফলে প্রতিবছর ০.২ - ০.৩ শতাংশ প্রজাতির প্রাণী লুপ্ত হচ্ছে। সর্বোপরি বলা যায়, উদ্ভিদজগতে অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন মানেই পৃথিবী থেকে প্রাণীজগতের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করা।

বৃক্ষছেদন নিয়ন্ত্রণের উপায় :

১। আইনকে কার্যকরী করা :

বৃক্ষছেদন বন্ধ করার জন্য সরকারকে কঠোর আইন প্রণয়ন করে বাস্তবে তার প্রয়োগ ঘটাতে হবে। দেখা যায় আইন অনেক প্রণয়ন করা হয়ে থাকে, কিন্তু তার বাস্তব প্রয়োগ হয় না। যেমন ভারত সরকার ১৯৮০ সালে Forest conservation Act. প্রণয়ন করেছিলেন। এই আইনের মাধ্যমে একটি হল - আইন লঙ্ঘনকারীকে উক্ত আইনের ২নং ধারা অনুসারে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু এই আইন বাস্তবে প্রয়োগ হয় না। আইনের বইয়ের পাতাতেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়। এই ব্যাপারে সরকারকে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা অবশ্যই কর্তব্য।

২। সামাজিক বনসৃজন :

National commission of Agriculture 1976 সালে সামাজিক বনসৃজন শুরু করে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য অব্যহৃত ও পরিত্যক্ত জমিতে অরণ্য স্থাপন করা। এই প্রকল্পের বাস্তব রূপায়ন করলে বৃক্ষচ্ছেদন কিছু নিয়ন্ত্রণ করা যাবে।

৩। পরিবেশ প্রতিরক্ষা পর্ষদ :

ভারতের ১৪টি রাজ্যে এবং ৩টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিবেশ ও অরণ্য সংরক্ষণের জন্য পরিবেশ প্রতিরক্ষা পর্ষদ গঠন করা হয়েছে। এইভাবে দেশে-দেশে, শহরে-শহরে, গ্রামে-গঞ্জে পরিবেশ প্রতিরক্ষা পর্ষদ দল গড়ে তুলে সক্রিয়ভাবে অরণ্য সংরক্ষণের পরিকল্পনা গ্রহণ করলে অরণ্যছেদন কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হবে। এছাড়াও কৃষি বনায়ণ, প্রগাঢ় বৃক্ষরোপন, উৎপাদক অরণ্য স্থাপন প্রভৃতির মাধ্যমেও বৃক্ষছেদন নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৪। সচেতনতা বৃদ্ধি ও ব্যক্তিগত কর্তব্য :

প্রতিটি ক্ষেত্রে চায় মানব সচেতনতা। যদি মানুষ সত্যি সত্যি সচেতন হয়ে যায় তাহলে সমস্যার সমাধান সহজ হয়ে যাবে। মানুষ যদি সচেতন হয়ে যায় তাহলে সরকারকে কোন ব্যাপারে কোন আইন প্রণয়ন করতে হয় না। আর যদি মানুষ সচেতন না হয় তাহলে কোন আইনই সমস্যার সমাধান করতে পারে না। তাই মানুষকে বৃক্ষছেদনের কুফলগুলি সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। চারিদিকে প্রচার প্রসার চালাতে হবে। ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মানুষকে দুটি কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। এই কর্মসূচী দুটি হল — a) বৃক্ষছেদন বর্জন। b) বৃক্ষরোপন প্রকল্প গ্রহণ।

আমরা যদি এই দুটি কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারি তাইলেই নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে পারবো। ব্যক্তিগতভাবে নিজেদের ফাঁকা জায়গা গুলিতে বৃক্ষরোপন করা যায়। অনেকে বলে আমাদের গাছ লাগাবার জায়গা নেই।' তাদের কাছে আমার আবেদন নিজেদের বাড়িতে অন্তত টবে বিভিন্ন ধরনের গাছ লাগালেও পরিবেশ কিছুটা উপকৃত হবে। মনে রাখতে হবে কোনো কিছুই ক্ষুদ্র নয়, ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহৎ লুকিয়ে থাকে। বিন্দু বিন্দু দিয়ে সিন্ধু তৈরি হয়। তাই আমাদের বৃক্ষছেদনের নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলি বা কর্মসূচীগুলি সক্রিয়ভাবে গ্রহণ করতে হবে। যাতে করে আমরা নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে পারি, যাতে করে টিকিয়ে রাখতে পারে পরিবেশের ভারসাম্য যাতে করে ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বলময় করে তুলতে পারি, আমরাও কবি সুকান্তের মতো এই বিশ্বকে নবজাতকের বাসযোগ্য করে তোলার দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করি।

''এই বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গিকার।''

শিক্ষার গুরুত্ব

ওবাইদুর রহমান
ভূগোল অনার্স, পঞ্চম সেমিস্টার

আমাদের দেশ ভারতবর্ষ, একটি বড় এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ। আমাদের দেশে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, পার্সি, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ বসবাস করে। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী তাদের ধর্ম পালনে অভ্যস্ত। বর্তমানে ভারতে ১২০ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে ৩৫ শতাংশ মানুষ এখন অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত, হতাশায় হাবুডুবু খাচ্ছে। জ্ঞান বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে মানুষ বর্তমানে মহাকাশে পাড়ি দিচ্ছে, কিন্তু অশিক্ষার গ্লানি থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ মুক্ত হতে পারেনি আজ পর্যন্ত। তার মধ্যে অন্যতম দেশ আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষ। আমাদের দেশে জনসংখ্যার এক বৃহত্তম অংশ অশিক্ষা-কুশিক্ষা অভিশাপে আজও জর্জরিত।

প্রত্যেক নরনারীর ক্ষেত্রে শিক্ষা অপরিহার্য কেননা শিক্ষা ব্যতীত কোন দেশ, কোন সমাজ কোন জাতি উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছতে পারে না। অতীতে শিক্ষা অর্জনের জন্য কোন গুরু বা গুরুগৃহে যেতে হত। কিন্তু অতীতের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার অনেকটা পার্থক্য রয়েছে। বর্তমান কালে শিক্ষা অর্জন করার জন্য স্কুলে, কলেজে (মহাবিদ্যালয়ে) বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হয়। তাছাড়াও মানুষ আজ শিক্ষা অর্জনের জন্য পাড়ি দিচ্ছে দেশের বাইরেও।

বর্তমানে আমাদের সমাজ, দেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। শিক্ষা ব্যবস্থার যত উন্নতি হবে দেশ, সমাজ, কোন জাতি ততই বেশি উন্নতশীল হতে সক্ষম হবে। শুধু তাই নয় মানুষকে অন্যায় কাজ থেকে দূরে রাখবে, সৎ হওয়ার উপদেশ দেয়। মানুষের মধ্যে শিক্ষা থাকলে শুধু শিক্ষা নয় প্রকৃত শিক্ষা থাকলে দেশে, সমাজে বা অন্য কোথাও অশান্তি কিংবা, হিংসাত্মক পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে না। প্রকৃত শিক্ষা মানুষের মন থেকে ধর্মীয় কুসংস্কার গোঁড়ামি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কুসংস্কার দূর করে সত্যের সঠিক সন্ধান দিতে পারে। প্রত্যেক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে অন্য ধর্মকে সম্মান কর তাহলে তুমি একজন প্রকৃত মানুষ। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যে একটি একটা বিশ্বজনীনতা আছে, যা মানুষের মনকে প্রসারিত করে, সচেতন করে, উদার করে, শুভ চিন্তায় সাহায্য করে, আমাদের অসত্য থেকে সত্যে, অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যায়, ন্যায়-অন্যায়, ভালো মন্দ পার্থক্য নির্ণয়, উদার চিন্তাশীল, সৎ সাহস এনে দেয়। এটা সম্ভব শুধুমাত্র শিক্ষিত মানুষের মধ্যে। বই-এর পাতা, নোট্স ইত্যাদি মুখস্থ করার পাশাপাশি বিষয়টিকে বুঝবার আয়ত্বে আনতে হবে। অশিক্ষার জগদ্দল পাথর কে সরিয়ে ফেলতে হবে। অন্ধ অজ্ঞ মানুষের আলোর পথ হল শিক্ষা।

আমরা যদি আমাদের দেশ, ভারতবর্ষকে একটি সমৃদ্ধশীল, উন্নতশীল দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, তাহলে যেটা সর্বাগ্রে প্রয়োজন তা হল সুশিক্ষা। শিক্ষাই পারে দেশের মানুষকে, সমাজকে উন্নতির পথে পৌঁছে দিতে। শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য আজ পাশ্চাত্য দেশগুলি উন্নতির শিখরে আরোহন করতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্বনবি হজরত মহম্মদ (সঃ) বলছেন যে, শিক্ষা অর্জনের জন্য সুদূর চীন দেশে যেতে হলেও যাও। তাছাড়াও বলছেন, ''জ্ঞানী ব্যক্তির কলমের কালির লেখা, শহিদের রক্তের চেয়েও দামী।"

আমাদের দেশের প্রতিটি মানুষ যদি শিক্ষিত হতে পারে, তাহলে আমাদের দেশ ভারতবর্ষও একটি সমৃদ্ধ, শক্তিশালী, উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হবে।

তাই অশিক্ষিত মানুষকে শিক্ষিত করার চরম দায়িত্ব ও পরম কর্তব্য ছাত্র / ছাত্রী হিসেবে তোমাকে পালন করতে হবে। Each one teach one নীতি নিয়ে প্রত্যেক মানুষকে এমনকি সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে।

কিছুক্ষণ

সালমান ইসলাম
পঞ্চম সেমিস্টার, পদার্থবিদ্যা অনার্স

সবে তখন সোয়াচারটে হবে। আমি হবু 3rd Year, আর 'পৌলমি' ইলেভেন টিলেভেন হবে। সাইকেল, অচল আর ব্যাগে বেচারা তখন নাস্তানাবুদ। বরাবরই আমি সুযোগ বিলাসী, ইচ্ছের দু এক পা এগিয়ে, ''আমায় দে ব্যাগটা, আমি ধরছি'' ...

মাঝে পাঁচ-পাঁচটা বছর কেটেছে, কপালে আলতো ভাঁজ পড়েছে, গালে একগোছা দাড়ি গজিয়েছে, বাস্তবতা আঁকড়ে ধরছে, বেকারত্ব পিছু তাড়া করেছে, আর ঘুরে দেখিনি বাকিটা।

আজ সাতসকাল স্টেশনচত্বর, দু-নম্বর প্ল্যাটফর্ম, একগাছা সদ্য Pass-out হেডলাইনের জটলা, কাধে ভারী স্কুলব্যাগ, চায়ের ভাঁড়বেয়ে উপচে যাওয়া ধোঁয়া, গুটিসুটি শীত বাঁচিয়ে বেশ কিছু লোকজন আর আমি মাফলার টুপি ইতি-উতি দুম করে সামনের এক নম্বর প্লার্টফর্মে পাঁচবছর আগের ইলেভেন-টিলেভেনের সেই 'পৌলমি'। হাজার বদলেছিস তাও ভাগ্যিস অল্প হাসলে গালটা তুবড়ে যায়। যথারীতি আঁচল সংসার আর ব্যাগ নিয়ে নাস্তানাবুদ। এপার থেকে অজান্তে মনটা যেন বলে উঠল — ''আমায় দে ব্যাগটা, আমি ধরছি'' ...

আমার অস্পষ্ট ভাষাটা, তোর সাথে আমার গড়ে ওঠা আপেক্ষিক emotion-এর হাত ধরে তোর কাছে পৌঁছতেই, কান ঝালাপালা শব্দের ট্রেনটা আমার emotion টাকে Just ধাক্কা মেরে ছিটকে দিলো। একা দাড়িয়ে আমি দেখছিলাম প্ল্যাটফর্মের ধারাঘেষে পড়ে থাকা আমার আহত, রক্তাত emotion টা যন্ত্রণায় ছটফট করছিল। আর তুই দিব্যি ওই ঘাতক ট্রেনটার হাত ধরে ওর ক্যুখ্যাত হৃদয়ে প্রশ্রয় নিলি। কিছুক্ষণ পর ট্রেন ছাড়ল। ট্রেনের Pass out করে যাওয়া প্রতিটি বগির বিকট আওয়াজে যদিও আমার হেরে যাওয়া সত্ত্বাটা অট্টহাসি হাসছিল, তবুও আধ-খোলা দরজা দিয়ে পুরোটা উগরে দিলাম, ''ওই তুই কিন্তু সাবধানে থাকিস কেমন?'' একটু করে আমাদের দুরত্বটা বাড়ছে। হাওয়াতে চুলটা বারবার চোখের উপর পড়ছে। যদিও দৃষ্টি হারাচ্ছি আমি জলছবিটা মরিচীকা। এখন শুধুই স্পষ্ট ট্রেনের শেষবগির cross-mark টা, যেটা আমার বাপাসটাকে কিছুক্ষণ আগেই আচঁড়ে দিয়ে গেল।

ড. বিমলচন্দ্র বণিক-এর দুটি কবিতা
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

এখনো সময় আছে

এত রক্তপাত কেন চারিধারে
গ্রামে গঞ্জে নগরে প্রান্তরে;
রোষ ক্ষোভ বঞ্চনা হিংসা খুন
ধোঁয়া ছড়ায় তুষের আগুন।
দাউ দাউ জ্বলছে বুক কোণে কোণে
ঘরে ঘরে মনে মনে,
উজাগর রাত আশংকায় স্তব্ধ
প্রহর গোনে;
কখন দাবানল ছড়ায় কে জানে?
বন্ধ কর এ আগুন, থামাও এ রক্তপাত
এ খেলায় কেউ জেতে না
কেউ করে না বাজিমাত
তোমায়ও সে যাবে খাক করে
স্বজন রবে না শূন্য ঘরে —
অদৃশ্য সূতোর ফাঁস ছিড়ে ফেলে
খুঁজে নাও শয়তান যে আছে আড়ালে।
দম দেয়া পুতুলের মতো বিবেকটারে
আর রেখো না বন্দী কোটরে
বন্ধু, এখনো সময় আছে
এখনো লেলিহান হয়নি শিখা,
পড়ে নাও নিয়তির অমোঘ লেখা।

তুমি আছো

যখন ভাবছিলাম, আর কোথাও তুমি নেই
চারিদিকে নিথর স্তব্ধতা —
আকাশ বলল 'আমার দিকে চেয়ে দেখো'
আমি দেখলাম,
মেঘে মেঘে ছড়ানো তোমার কুন্তল,
দুরন্ত শিশুর মতো খেলে বাতাস
আমি সারাদিন সেই বৃষ্টিতে ভিজলাম —
দেখলাম অরণ্যের সবুজে সবুজে তোমার প্রশস্তি
শিহরণ জুড়ে সেই সবুজতা
আমি মাখলাম;
বসন্তের শাখায় শাখায় ছড়ানো তোমার হাসি
সেই হাসির অলক্ষ্য জোয়ারে
আমি ভাসলাম;
যেতে যেতে কুলুকুলু নদী বললো, তুমি আছো
তরঙ্গে তরঙ্গে বিছানো
সেই অনন্ত লহরে অনুভবের তরী
আমি বাইলাম —
দেখলাম সাগরের নীলে নীলে আছো তুমি
অনন্তবিহারী, হাজার মাণিক্য-মণিতে
সারাদিন সেই অনন্ত সৈকতে মুক্তো খুঁজে
আমি ফিরলাম;
চেতনার সব বন্ধ দুয়ার খুলে
নতুন হয়ে নতুন করে আবার তোমাকে
আমি পেলাম।

নিমাইচন্দ্র সাহা-র দুটি কবিতা

নতুন আলোর সূর্য

সেই সূর্যের জন্য
প্রতি প্রত্যুষেই সিড়ি ভাঙতে হয়

সূর্য প্রতিদিনই ওঠে
পৃথিবী আলোকিত হয়
বলে চলে প্রাত্যহিক জীবন প্রবাহ

কিন্তু এত কবন্ধ !
এত কবন্ধ চারিদিকে
মস্তকহীন সুসজ্জিত শরীর
শহরে-নগরে-গ্রামে-গঞ্জে সর্বত্র
মুখ নেই অতএব ভাষা নেই
মস্তিষ্ক নেই অতএব ভাবনা নেই
হাত আছে
তা কেবল হাত তোলারই জন্য

তবুও মাঝে মাঝে নিজেকে
ভীষণ শক্তিশালী মনে হতে থাকে
তখন পৃথিবীটাকে হাতের মুঠোয় এনে
খুঁজে পেতে হাজার মস্তক
জোড়া দিয়ে ফেলি প্রতিটি কবন্ধে
মুখে দিই প্রতিবাদের ভাষা
সমবেত জনতার সমবেত উচ্চারণ
সমবেত কর্মপ্রণালীর
সমবেত ফসল-ফলন
গড়ে ওঠে নতুন
সব কিছু নতুন-সঠিক ও সুন্দর
নতুন আলোর এক নতুন সূর্য ...

ভাবনা ও বাস্তবতা

ধরে নেওয়া যায় যদি
হাত ধরে হাঁটছি দুজনে
অন্তহীন নিরুদ্দেশ যাত্রায়

কখনও অন্য হাত চলে যায়
সাগরের ঢেউ ছোঁয়া ভাসমান নৌকায়
কখনও
ব্রীড়াবনত কুঞ্চিত কেশের কোমল গ্রীবায়

খ্যাপামিরও একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে
তাই তখন
হাত ছেড়ে হাত রাখতে হয়
ইঁটে কাঠে পিচে পাথরে
বাস্তবের কঠোর কংক্রিটে
নয়তো বা
কৃত্রিম গাছপাতার গৃহসজ্জায়
স্বচ্ছ প্লাস্টিকের শিশির বিন্দু লেগে আছে যেখানে

কবি ও গল্পকার নিমাই সাহা জঙ্গিপুর কলেজের প্রাক্তনী।

অপর্ণাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী-এর দুটি কবিতা

প্রাক্তন ছাত্র

দোল বিষয়ক

ভীষণ উতলা বাইরে ফাল্গুন
পর্দা টানা ঘর দোর আঁটা
হারানো দোলবেলা এড়িয়ে পথচলা
জীবন যাপনে সাদামাটা।

ভিতরে লুকোনো গোপন খয়রাতি
আহারে বেচারা মুখচোরা
পথে যে কত ভয় আর্থ-সামাজিক
বদ্ধ ঘরে তবু কড়ানাড়া।

বেশ তো রয়েছি সাজানো সুখীঘর
খাদ্য বস্ত্র বাসগৃহ
লব্ধ নিয়ে থাকি না পাই বাদবাকি
শান্তিপ্রিয় এক নিস্পৃহ।

পুত্র-কন্যা আবীর খেলা করে
ছোট্ট উঠোনে ভাই-বোনে
আমার হোলিখেলা - এলিয়ে ছেলেবেলা
স্তব্ধ নিভৃত গৃহকোণে।

মুগ্ধ দোলবেলা কোথায় খেলা করে
মাতা কী গৃহবধূ প্রধানত?
আলতো দু'হাতে চেয়েছি রাঙাতে
রঙ ও আবীরে যথাযথ।

আমরা পেরিয়ে যাব

পথ ঘোরে পথের আড়ালে পথে পথে কত শত বাঁক
পথে পথে আমরা পথচারী ভুলপথে খাচ্ছি ঘুরপাক।
কোনো পথ নয় অনায়াস কোনোপথ নয় বাধাহীন
পথে যেতে যেতে বোঝা যায় সেই পথ কতটা মসৃণ।
পথের আদরে চোরাবালি পথের গভীরে চোরা স্রোতও
পথের ভিতরে কত ক্ষয় কত বাধা আর কত ক্ষত।
আমরা আজকে দিশাহারা সময়ের ভিন্ন অভিযাতে
নিজেরাই ভেঙে খান খান - কে কার হাত রাখি হাতে:
আমাদের সঙ্গী পথচারী আমাদের প্রেম ও প্রত্যয়
ভুল পথে বয়ে যাবে নাকি? ভুলপথে হয়ে যাবে ক্ষয়!
চারিদিকে আলো ঝলমল চারিদিকে মুগ্ধ হাতছানি
এর মাঝে তবু বেঁচে রবে মানবের মূল মন্ত্রখানি।
সে লক্ষে দৃষ্টি রেখে স্থির সে মন্ত্রে বিশ্বাস রেখে দৃঢ়
আমরা পেরিয়ে যাব পথ হোক না সময় ঘোরতর।

রীণা কংসবণিক-এর দুটি কবিতা

প্রাক্তন ছাত্রী, ইতিহাস বিভাগ

প্রতীক

হেমু সৌরেন।
আদিবাসী মেয়ে। হেমু সৌরেন। আমিই।
দক্ষিণ আমাকে ডাকে —
বাম আমাকে ডাকে —
ছুটে যাই দক্ষিণে। শূন্যথালা। রাহাজানি।
ছুটে যাই বামে। ধর্ষণ! হানাহানি!

নিপীড়নের সামনে দাঁড়িয়ে আবহমান —

আমি অবিচার, অসাম্যের প্রতীক;
কে ডাকে? মানুষ বলে আমাকে কে ডাকে?

যুদ্ধ

'মুখে যদি রক্ত ওঠে
সে কথা বলাও এখন পাপ'
— বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভয় দেখিয়ে লাভ নেই আর
রক্ত ঝরিয়েও —
সরিয়ে নাও আগ্নেয়াস্ত্রটি এবার
নইলে ...

আমাদের কোনও দেশ নেই
আমাদের কোনও পার্টি নেই
আমাদের কোনও শিল্প নেই
আমাদের কোনও ধর্ম নেই।
ভাষা নেই আমাদের। নেই। নেই।

মৃত্যুর সীমানা আছে আমাদের
আছে বাঁধাভাঙা প্রতিরোধ
অভিশপ্ত জীবন আছে, ছোঁয়াচে ভীষণ

প্রহারে প্রহারে পরাজিত সৈনিক —
এখন শুধু যুদ্ধ বুঝি। যুদ্ধ!

GOVERNING BODY OF JANGIPUR COLLEGE

President :

Sri Abdul Quader

Teacher-in-Charge & Secretary :

Dr.Naba Kumar Ghosh

Members:

Sri Koushik Singha, Govt. Nominee
Sri Sayed Abdus Sadek, Govt. Nominee
Sri Soidul Miah, Govt. Nominee
Dr. Bikash Kumar Panda, Teacher Representative
Mr. Prasenjit Mistry, Teacher Representative
Mr. Keshab Chandra Ghosh, Teacher Representative
Mr. Mrityunjoy Sinha, Non Teaching Representative

TEACHING FACULTY

Teacher-in-Charge :

Dr. Nabakumar Ghosh, M.Sc, Ph.D

Bengali:

1. Dr. Nurul Mortoza, M.A., Ph.D
2. Dr. Bimal Chandra Banik, M.A.,M. Phil, Ph.D
3. Smt. Aparupa Ghosh, M.A.
4. Dr. Raktim Sarkar, M.A., Ph.D
5. Sri. laxmiram Murmu, M.A.
6. Sri. Pabitra Das, M.A.
7. Sri. Subhankar Das, M.A., M.Phil
8. Smt. Puja Karmakar, M.A. M.Phil

English:

1. Dr. Basudeb Chakrabarti, M.A., Ph.D
2. Sri. Tarun Mandal, M.A.
3. Sri. Tanmay Ruidas, M.A.
4. Sri. Azaharuddin Sk. M.A.

Sanskrit:

1. Sri Biplob Das, M.A., M.Phil
2. Smt. Sompa Pal, M.A.
3. Smt. Selina Khatun. M.A.
4. Sri Shighra Rajbanshi, M.A.

Political Science:

1. Smt. Gangotri Bhattacharya, M.A.,M. Phil.
2. Dr. Koyel Basu, M.A., Ph.D
3. Sri. Sibeswar Kundu, M.A., M.Phil
4. Sri. Manirul Islam, M.A.

Philosophy:

1. Sri Haripada Rath, M.A.
2. Smt. Ranita Mitra, M.A., M.Phil
3. Sri Asim Das, M.A.
4. Sri. Pasenjit Das, M.A.

History:

1. Sri Nishikanta Mandal, M.A.
2. Sri Sushendu Biswas, M.A.
3. Sri Keshab Chandra Ghosh, M.A., M. Phil.
4. Dr. Biswajit Das, M.A., Ph.D
5. Smt Dolon Champa Ghosh, M.A

Geography:

1. Smt. Riya Biswa, M.Sc

2. Vacant
3. Sri. Kaji Aminul Islam, M.A.
4. Sri Asraf Ali M.A.
5. Sri Farakul Islam M.A.
6. Smt. Mou Bhattacharya M.A.

Economics:

1. Sri Krishnendu Palchoudhuri, M.A., M. Phil.
2. Vacant

Commerce:

1. Sri Pritimoy Majumder, M.Com
2. Sri. Chiranjib Saha, M.Com
3. Vacant
4. Sri Akhtarul Islam, M.Com

Physics:

1. Dr. Avik Kumar Sanyal, M.Sc, Ph.D
2. Dr. Susmita Sanyal, M.Sc, Ph.D
3. Dr. Aksar Ali Biswas, M.Sc., Ph.D
4. Sri. Sujay Kumar Singha, M.Sc
5. Smt. Dalia Saha, M.Sc.
6. Vacant

Chemistry:

1. Dr. Bikash Kumar Panda, M.Sc, Ph.D
2. Sri Prasenjit Mistry, M.Sc.
3. Dr. Rajib Joarder, M.Sc., Ph.D
4. Dr. Naba Kumar Ghosh, M.Sc, Ph.D
5. Dr. Susmita Roy, M.Sc. Ph.D
6. Dr. Kanchan Mal, M.Sc. Ph.D

Mathematics:

1. Dr. Ashis Mondal, M.Sc. Ph.D
2. Sri. Tarak Mandal, M.Sc
3. Dr. Sudipta Paul, M.Sc, Ph.D
4. Vacant

Zoology:

1. Sri. Anup Kr. Mandal, M.Sc.
2. Smt. Nabanita Mukherjee, M.Sc
3. Smt. Ankita Mishra, M.Sc
4. Sri Pithwis Sarkar, M.Sc
5. Vacant

Botany:

1. Dr. Chumki Chowdhury, M.Sc, Ph.D
2. Sri. Suman Karmakar, M.Sc
3. Dr. Soumya Mukherjee, M.Sc. Ph.D
4. Sri Shib Nandan Das, M.Sc

Environmental Studies:

1. Smt Debjani Pal, M.Sc
2. Sri Rizwanul Islam, M.Sc

Library

1. Hedayat Hossain, MLISc.

NON TEACHING STAFF

Office:

1. Sri Mrityunjay Singha, B.A. (Typist)
2. Sri Chiranjib Dutta, O-Level (Casual Computer Technician-cum-Typist)
3. Sri. Rajendranath Banerjee, (Accountant)
4. Sri. Bapi Das, (Casual Computer-Clerk)

Laboratory:

1. Smt. Jayram Sarder (Chemistry)
2. Rakesh Sk (Casual, Chemistry)
3. Sri Naba Kumar Singha (Physics)
4. Smt Bandana Das (Botany)
5. Sri Amar Das (Casual, Zoology)
6. Sri Palash Saha (Casual, Geography)

Library:

1. Sri Jawharlal Singha
2. Sri Soumya Chakraborty (Casual Library Literate Peon)

Hostel:

1. Smt Sephali Bhaskar
2. Sri Raghunath Das
3. Sri Mantu Sk
4. Habibur Rahaman Mirza (Casual)
5. Puspal Pramanik (Casual)

4th Grade Office Staff :

1. Pandab Majhi (Casual)
2. Chayan Das (Casual)

Guard:

1. Sri Dipak Roy
2. Sri Paban Das (Casual)

Jamader:

1. Sarfaraj Sk (Casual)

Gas/Generator/Pump Operator:

1. Sri Biswajit Das

‘‘যদি কোন সমস্যা সমাধানের জন্য আমার হাতে ১ ঘন্টা সময় থাকে তবে আমি ৫৫ মিনিট ওই সমস্যাটি সম্পর্কে জানবো এবং ৫ মিনিট আমি সেটি সমাধান করার কথা ভাববো।’’

— **আলবার্ট আইনস্টাইন**

‘‘একটি ক্ষুধার্ত কুকুরকে তুমি যদি পরিচর্যা করো সে তোমাকে অন্তত কামড়াবে না, এটা নিশ্চিত থাকতে পারো।
এটাই মানুষ আর কুকুরের মধ্যে মূল পার্থক্য।

— **মার্ক টোয়েন**

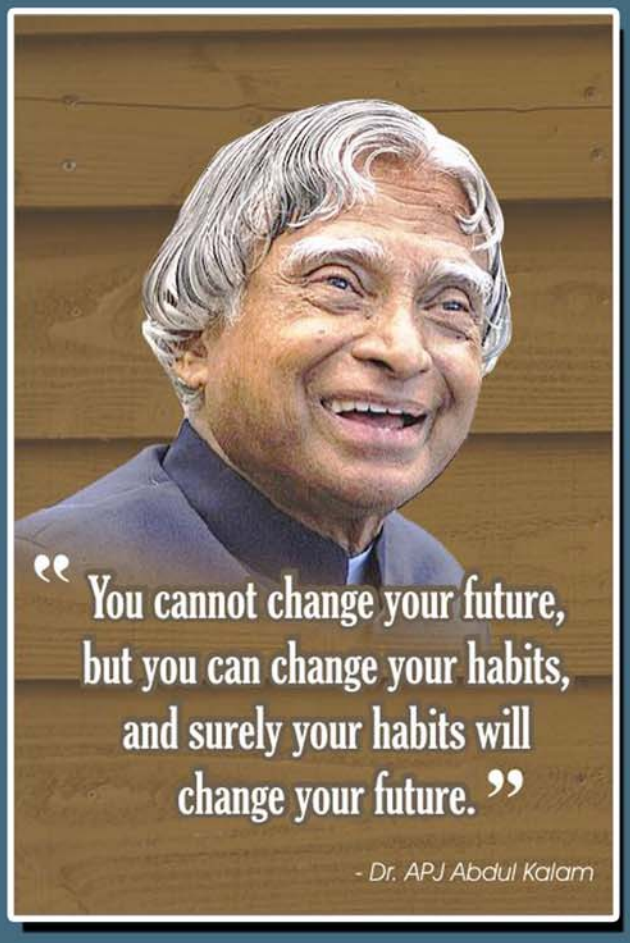
“You cannot change your future,
but you can change your habits,
and surely your habits will
change your future.”
- Dr. APJ Abdul Kalam